আবু গারিবের বন্দি

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

আবু গারিবের বন্দি

(কিশোর সংস্করণ)

বাংলা রূপান্তর

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

অর্পণ

কুৎসিত ও বীভৎস নীল নক্সা নিয়ে ইসলামকে যারা বদনাম করতে চায় এবং ইসলামের অন্যতম প্রতিরক্ষা স্তম্ভ জিহাদকে সন্ত্রাস আখ্যা দিতে সুক্ষ্ণ প্রচারণায় লিপ্ত সেই হতভাগা দুর্ভাগা দুর্মনা কমিনাদের সুমতি কামনায়...

ভূমিকা

'আবু গারিবের বন্দি' একটি গল্পগ্রন্থ। আরব বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক-সাহিত্যিকের আরবী ছোট গল্পের বাংলা রূপ। বাংলা রূপায়নে শব্দের চেয়ে ভাবকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকৃত ফিলিস্তিন, মাজলুম ইরাক ও ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসকে ঘিরেই মূলত গল্পগুলো নির্মিত হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্যের ভাষায় চিত্রিত হয়েছে ইসলামী ঐতিহ্য ও চেতনা। পাশাপাশি ঝংকৃত হয়েছে জুলুম, শোষণ ও পাশবিকতার বিরুদ্ধে শিল্প-শাণিত সুক্ষ্ম প্রতিবাদ। বিধ্বস্ত মানবতা যাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়, মাজলুমের আহাজারি যাদের মানবতাবোধে বেদনার ঝড় তোলে এবং সত্যিকারের শিল্প-সুন্দরকে যারা ভালবাসে, **'আবু গারিবের বন্দি'** আশাকরি তাদেরকে অনেক খোরাক যোগাবে।

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
বনশ্রী, ঢাকা
০১৮১৫৪৬১২২৭

সূচীপত্র

আবু গারিবের বন্দি

হঠাৎ করেই ও আমার সামনে এসে হাজির হলো। কিন্তু ওর লম্বা 'উন্নত শির'টা আজ ঝুঁকে আছে বাঁকানো ধনুকের মতো। আমি আঁতকে উঠলাম। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো ঝড়োতাণ্ডব বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। ওর বিধ্বস্ত চেহারা ও বেদনা-মলিন চোখের দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। ও কিছু বলার আগেই একরাশ উদ্বেগ নিয়ে আমি জানতে চাইলাম–
'কেনো? কেনো তুমি ওখানে গিয়েছিলে? কেনো তুমি নিজেকে জড়ালে?'

নীরব ক্লান্ত দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকালো। বড়ো অস্থির- করা দৃষ্টি। বড়ো বেদনা-সঞ্জাত দৃষ্টি। কিন্তু মুখে ও কিছুই উচ্চারণ করলো না। বরং বাসামুখো হাঁটা শুরু করলো। আমি কথা না বলে দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। এ অবস্থায় ওকে একা ছাড়া মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। আমিও সঙ্গে বের হলাম। ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছে। একরাশ 'অসহায়' প্রশ্ন বুকে ধারণ করে আমি নীরবে ওকে কাছ ঘেঁষে অনুসরণ করে চলেছি। রাতের নির্জন প্রহর। চারদিকে সুনসান নীরবতা। ওর বুকের ভিতরে লুকোনো সর্বগ্রাসী বেদনার একটা অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না। ওর চোখে একটা কিছু ছিলো। যা অন্ধকারে আমি পড়তে পারছিলাম না। অথবা তীব্র ব্যথায় তা ছিলো অস্বচ্ছ।

খুব বেশি দিন নয়– মাত্র কয়েকটা মাস ও নিখোঁজ ছিলো। কিন্তু মনে হয়েছে যেনো বছর বছর ও আমাদের মাঝে ছিলো না। আমার কাছে তো মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে কয়েক যুগের পর্দা যেনো আমাদের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অনেক সময় এমন মনে হয়-ই। হঠাৎ কারো সাথে কিছুদিন

দেখা না হলে পরে যখন তার মুখোমুখি হই, মনে হয়– মানুষটা কতো বদলে গেছে! যেনো অন্য কেউ।

আমি বাড়ি পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিলাম। বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করতেই সবাই ছুটে এলো ওকে অনেক দিন পর ফিরে পেয়ে স্বাগত জানাতে। সবাই সালাম দিচ্ছিলো উদ্বেগভরা কণ্ঠে। ব্যথাঝরা অভিব্যক্তিতে। কিন্তু ওর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো না। কেবল বিভ্রান্ত চোখে আশ-পাশে তাকাচ্ছিলো। যেনো ভিন্ন একটা পরিবেশে, অপরিচিত একটা জায়গায়, অচেনা কিছু মানুষের ভিতরে ওকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অথবা বাইরের দুনিয়ার মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার দিন যেনো ওর ফুরিয়ে গেছে। তাই অজানা এই নিজের জগতেই ও আশ্রয় নিলো, ব্যর্থতা ও বেদনার জ্বালা বুকে চেপে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার পথ ধরলাম। বললাম–
'তোমরা দুশ্চিন্তা করো না। কাল আমি আবার আসছি। যদ্দুর মনে হচ্ছে; ও আর আগের অবস্থা ফিরে পাবে না। আমরা এখন এমন এক মানুষকে ফেরত পেয়েছি, যে নিজের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে সময়ের পূর্বেই 'বিদায় জানিয়েছে'– জীবনের কোলাহল থেকে দ্রুত অবসর গ্রহণের জন্যে।'

ওর স্ত্রী (আমার বোন) আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো–
'ভাইজান, রাতটা থেকে যান! আপনি থাকলে ওর যদি একটু উপকার হয়! আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও!'
আমি চুপচাপ বোনের কথা শুনলাম। কিন্তু থাকার জন্যে নিজেকে কোনোভাবেই তৈরী করতে পারলাম না। আমার কাছে মনে হলো; আমি থাকলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশী। ওর এখন দরকার একাকীত্ব, খাট, অন্ধকার, নীরবতা। আমি বাসার পথই ধরলাম।

সারাটা পথ আমার মাথায় ভিড় করলো বিভিন্ন চিন্তা ও দুশ্চিন্তা এবং শঙ্কা ও আশঙ্কা। কী করে ও আমাদের এই ছোট্ট শহরে পৌঁছলো? এই নাজুক অবস্থা নিয়ে? ব্যর্থতার পায়ে ভর করে না নীল বেদনার কন্টকাকীর্ণ পাখায় ভর করে?

কী সেই কঠিন ঝড় যা ওর উপর দিয়ে বয়ে গেছে? রেখে গেছে নৃশংসতার এমন পোঁচ পোঁচ দগদগে দাগ? আগামীকাল কি জানতে পারবো ওর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই ঝড়ের 'তাণ্ডব-কাহিনী'? ও কি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে সব বলবে? না না-বলা বেদনার তাপদাহে নীরবে দগ্ধ হতে হতে অভিমান করে 'এই সভ্য দুনিয়াকে' বিদায় জানিয়ে চলে যাবে? কয়েক মাস আগেও তো আমার এই 'বন্ধু-আত্মীয়'টি আনন্দ-উচ্ছলতায় মজলিসকে মাতিয়ে রাখতো! ওর ছাদফাটা হাসি আর কি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে? আনন্দ-উচ্ছলতার একটা ব্যাগ যেনো সব সময় সাথে করে ও বয়ে বেড়াতো। যখনই এবং যেখানেই ও আমাদের সঙ্গে বসতো তখন সেখানেই তা খুলে দিতো– এক দক্ষ সাপুড়ের মতো। সেই ব্যাগভরা আনন্দ-উচ্ছলতার সৌরভে কেটে যেতো নিমিষেই আমাদের দুঃখ-বেদনার গ্লানি এবং ক্ষোভ-অসন্তুষের স্তূপ-স্তূপ হতাশা। কোনোদিন বেদনার ছাপ দেখি নি ওর মুখে। তাহলে কোন্ সে ঝড়ের কবলে কবলিত হয়ে ও এ সম্পদ হারালো? আমরা হারালাম মজলিস কাঁপানো এক বন্ধু? হাসি-আনন্দের একটা 'জীবন্ত ব্যাগ'?

বাড়িতে এসে অন্ধকারকে আশ্রয় করে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। তন্দ্রা এসে এসে আমাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না– 'বন্ধু-চিন্তায় অস্থির' আমার মনটাকে কাবু করতে। অনিদ্রায়-দুশ্চিন্তায় রাতের শেষ প্রহরটাও কেটে যায়-যায় অবস্থা। একেবারে শেষ দিকে ঘুমের জগতে প্রবেশ করতেই ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের কবলে নিক্ষিপ্ত হলাম।

দেখলাম, একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেনো ওকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ওকে ঘিরে ফেলে এবং ঝেঁপে পড়ে ওর শরীর থেকে নখাল আঁচড়ে মাংস 'ছিড়তে' থাকে। দেখছিলাম– একটি একটি করে অঙ্গ ওর দেহ থেকে খসে পড়ছিলো আর ও ঝুঁকে ঝুঁকে তা তুলে নিচ্ছিলো এবং প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছিলো। দেখতে দেখতেই ওর আকৃতি বিকৃত হয়ে গেলো। এক বীভৎস প্রাণীতে রূপ নিলো। কিন্তু তারপরও ও নেকড়েদের সাথে 'আপোষ' করলো না। তুলে তুলে সব অঙ্গই শরীরে প্রতিস্থাপন করলো। ওর ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত দেহ থেকে রক্ত ঝরছে, ব্যথায়-ব্যথায় শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে, তবু সে স্থির

দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখলাম তার দেহ থেকে 'ফোয়ারা-গতিতে' রক্ত ছুটেবের হচ্ছে। আশ-পাশ ছাপিয়ে তা এক 'রক্ত-নদীতে' রূপ নিয়েছে। যেনো এক খরস্রোতা নদী। সামনে যা পাচ্ছে তা-ই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি হিংস্রোন্মাদ নেকড়েগুলোও রেহাই পেলো না। আর ও স্থির দাঁড়িয়ে আছে প্রতিস্থাপন ও প্রতিষেধনের সাধনায়।
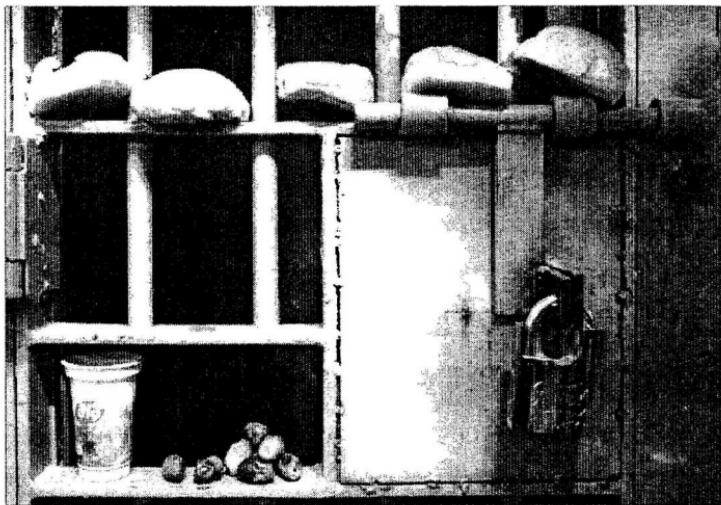
আবু গারিব কারাগারের একটি কক্ষ, গরাদের ফাঁকে কিছু বাসি রুটি, নিচে একটি জীর্ণ গ্লাসের পাশে কয়েকটি খেজুর।

এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখি– আমার ঘামে ঘামে বিছানাটা ছোপ ছোপ। সব মিলিয়ে দু' ঘন্টার বেশী ঘুমাই নি। এর মধ্যেই দেখলাম আঁধার চিরে 'সূর্যালোক-বাহিনী' ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। দ্রুত উঠে জামাটা পরলাম এবং ওর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। ভুলে গেলাম চেহারায় লেগে থাকা রাতের অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি– 'লালা-চিহ্ন' পরিস্কার করতেও। যুগপৎ ফিরে পাওয়া বন্ধুর চেহারায় পরিস্ফূট বাস্তব দুঃস্বপ্ন আর একটু আগের ঘুমের দুঃস্বপ্নের কবলে পড়লে এ সব মনে থাকবে কী করে?

আমার বোন দরোজা খুলে দিলো নীরবে। ওর চোখ-মুখ দেখে মনে হলো

যেনো কৃশতা ও মৌনতার সংক্রামকে ও আক্রান্ত হয়েছে। আমি জানতে চাইলাম–

'ওর অবস্থা এখন কেমন?'

ও হতাশ কণ্ঠে জবাব দিলো–

'জানতে চাওয়ার মতো ওর কোনো অবস্থাই নেই। কিছুই খায় নি, কারো সঙ্গে কথা বলে নি, কারো অনুরোধে সাড়া দেয় নি। আমার মনে হয়; পারলে ও নিঃশ্বাস ফেলাই বন্ধ করে দিতো। দরোজা আটকে সেই যে ঘুমিয়েছিলো এখনো উঠে নি। হাব-ভাবে সবাইকে বলে দিয়েছে ওকে যেনো কেউ না ডাকে। কেউ যেনো কাছেও না ভিড়ে।'

আমি উদ্বিগ্নচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম– গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সারা মুখে ছড়িয়ে আছে অব্যক্ত বেদনা আর মধ্যকপালে একটা কুঁচকানো ছাপ। কোনো ঘৃণ্য ও পঙ্কিল দৃশ্য দেখলে চেহারা যেমন কুঁচকে যায়, ঠিক তেমন। দরোজাটা ভিড়িয়ে আমি বের হয়ে এলাম। ঘুমাক। ঘুম ওর বড্ড প্রয়োজন। হয়ত ঘুমে ঘুমেই ওর ক্লান্তি ও বেদনার ছাপ কিছুটা দূর হলে হতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন মনে হলো যে, এবার ওর ঘুম পূর্ণ হয়েছে, দরোজায় মৃদু নক করলাম। কোনো সাড়া না পেয়ে নিঃশব্দে দরোজাটা ঠেলে প্রবেশ করলাম। দেখলাম– একমাত্র জানালাটাও বন্ধ। ভারী পর্দা টানা। আলো প্রবেশের সকল পথই বন্ধ। অন্ধকার কি ওর কাছে এখন প্রিয় হয়ে উঠেছে? কাছে গিয়ে দেখলাম বোনের কথাই সত্যি। শ্বাস-নিঃশ্বাসের শব্দটুকু না থাকলে আমি ওকে মৃত ভাবতেই বাধ্য হতাম।

মৃদু নাড়া দিলাম শরীরে। অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম–

'এই! জাগবে না? আর কতো ঘুমাও! সকাল হয়ে গেছে!'

চোখ না খুলেই ও জবাব দিলো–

'সকাল! কীসের সকাল? প্রলাপ বকছো তুমি!'

আমি বললাম–

'উঠো! কথা বলো। তোমার 'আনন্দঘন' কথা শুনতে আমি 'উন্মুখ' হয়ে আছি!'

এবার ও চোখ খানিকটা ফাঁক করলো। যেনো ঘুম চলে যাওয়ার আশঙ্কায়। বললো–
'কথা বলে কী লাভ? দরোজা খুলে বাইরে গিয়ে সকাল দেখো! এ ছাড়া আমার বলার আর কী আছে?'
বিস্মিত কণ্ঠে বললাম–
'উঠো! তোমার সন্তানরা অপেক্ষা করছে।'
ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো–
'অপেক্ষা! ওদের বলে দাও, আমার জন্যে অপেক্ষা না করতে! আমি ফিরে আসি নি!!'

ওর কথায় আমি হতবাক! বিস্মিত! আন্দোলিত! ব্যথিত! তারপরও আমি ওর ইচ্ছাকে মূল্য দিলাম। দরোজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম।

একটা হলঘরে সবাইকে নিয়ে বসলাম। ঠিক হলঘর নয়– দিনের বেলায় তা ব্যবহৃত হতো কখনো হলঘর, কখনো মেহমানখানা আর কখনো খাবার ঘর হিসাবে। আর রাতে তা বদলে যেতো শয়নকক্ষে। ওর ছেলে দু'টির বয়স এখন তের ছাড়িয়ে গেছে। তাই মেয়েদের জন্যে আলাদা জায়গা আর এদের জন্যে এই হলঘরটা। আমার বোন চা নিয়ে এলো। আমার সামনে বসলো। ওর চেহায়ায় তাকিয়ে দেখলাম– অশ্রু-ছলোছলো অসহায়-কাতর দু'টি মলিন চোখ!
একটু পর ও আমাকে কৌতূহলী শিশুর মতো জিজ্ঞাসা করলো–
'ওর কী হয়েছে?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতার পরও বুঝতে পারলাম না– আমি কী জবাব দেবো? মুশকিল হলো, আমি কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। তবু 'কৃত্রিম' সান্ত্বনা দিয়ে বললাম–
'ভেঙে পরিস না! ধৈর্যে বুক বাঁধ! ও ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটু সময় লাগবে। আমি এখনো জানি না– ওর উপর দিয়ে কী ধরনের ঝড় বয়ে গেছে। তবে সে ঝড় যে অনেক ভয়ঙ্কর ও বীভৎস– তাতে অন্তত আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। ও ফিরে এসেছে। আমরা তো ওর

ফিরে আসার ব্যাপারে এক রকম হতাশই ছিলাম!'

আমার বোন আমার কথায় সায় জানিয়ে বললো–
'হতাশ তো আমিও ছিলাম। কতোবার মনে আশঙ্কা জেগেছে– ও বুঝি আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। মাঝে মধ্যে ভাবতাম ও বুঝি .....!!'
আমার বোন 'মৃত্যু' শব্দটা উচ্চারণ করলো না। খানিকটা নীরবতার পর বললো–
'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। যিনি ওকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে এনেছেন নিরাপদে।'
আমি প্রচণ্ড একটা দংশন অনুভব করলাম। 'ও নিরাপদে ফিরেছে' কথাটাই এর কারণ। আসলে কি ও নিরাপদে ফিরেছে? আমি তো এখনো ওর মাঝে এমন কোনো লক্ষণ দেখি নি!

আমি দীর্ঘ সময় ধরে আমার বোনের বাড়িতেই স্থির পড়ে থাকলাম। আমি ছাড়া ওকে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আর কে সান্ত্বনা দেবে? বসে বসে হতাশচিত্তে অপেক্ষা করছিলাম এই 'সাময়িক মৃত্যু' থেকে কখন ও জেগে উঠবে। নাকি ও একে স্থায়ী মৃত্যুতে রূপ দিতে চায়!

অপেক্ষার প্রহরগুলো যখন ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিলো তখন দেখা গেলো ও দরোজা খুলে বেরিয়ে আসছে ধীর পায়ে। অতি ধীর পায়ে। যেনো মনের প্রচণ্ড অনিচ্ছায় ও আমাদের কাছে আসছে। আলোতে আমি তার চেহারা-সূরত দেখে আঁতকে উঠলাম। ফিরে আসার পর আলোর মুখে এই প্রথম ওকে দেখলাম। মৃতই বলা যায়। মৃদু পদসঞ্চালনের কারণে শুধু পা দু'টিকে জীবন্ত মনে হচ্ছে। না! আসলেই ও মৃত! হৃদয়ে পোষা আনন্দ-থলেটি হারানোর সাথে সাথে শরীরের সিংহভাগ ওজনও ও হারিয়ে বসেছে। বন্ধুবৎসল আড্ডা এবং কৌতুকপূর্ণ বৈঠকি গল্পের অতীত ছন্দময়তা কি আর ফিরে আসবে না?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো– নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন। আমাদের প্রতি ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আশ-পাশের কোনো কিছুর প্রতিও ওর কোনো আগ্রহ নেই। এই যে অনেক দিন ও এখানে, এ বাড়িতে ছিলো না, সে জন্যে

এ বাড়ির কোনো জিনিসের প্রতিও ওর কোনো আলাদা দৃষ্টি পরিলক্ষিত হলো না। এমন কি একান্ত আপন– স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও ক্ষণিকের জন্যে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো না।

ও একটা চেয়ারে এসে বসলো। মুখে নেই ভাষা। চোখে শুধু রাশি রাশি হতাশা। আমার বোনের চোখ দু'টিতে আশার একটা ক্ষীণ আলো ঝলমল করে উঠলো। স্বামীর পছন্দের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনে ও উঠে দাঁড়ালো। মধ্যাহ্নভোজ না বলে নৈশভোজ বলাই ভালো। সূর্য বেশ আগেই অস্ত গিয়েছে। কিন্তু আয়োজন বৃথা। আমাদের কারো অনুরোধই ও রাখলো না। খাবার গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকলো। খাবারের প্রতি ওর কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হলো না।

কী হয়েছে আসলে? ও কি অস্থির? ক্লান্ত? পরাজিত? ও কি জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে চায়? ও কি ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ? কিন্তু কেনো? কিসের উপর? ও যাই হোক, হলফ করেই বলা যায়– ও এখন ক্ষুধার্ত নয়। অন্তত খাবারের প্রতি ওর কোনো ক্ষুধা নেই। সব জিনিসের প্রতি ওর চরম অস্বাভাবিক অনিহাকে তবু আমি সম্মান জানালাম। বোনটাকে ইশারা করলাম খাবার সরিয়ে ফেলতে। আমাদেরকে একা বসতে দিতে। আমি একান্তে ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই। একেবারে ছোটবেলা থেকে গড়ে-ওঠা আমাদের সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বটা সম্ভবত ওর অব্যক্ত দুঃখ-বেদনায় শীতল সমীরণ প্রবাহিত করবে এবং ওর কাঁধ থেকে কোনো কঠিন বোঝা নামিয়ে দিয়ে অনন্ত সমাহিত মনোজ্বালাকে কিছুটা তাপহীন করবে। তখন হয়ত ওর মর্মবেদনার কপাটগুলো একে একে খুলে যাবে। রহস্যও উন্মোচিত হবে। বন্ধুত্বের এই দাবি নিয়েই আমি বললাম–

'বন্ধু! আমি তো সব সময়ই ছিলাম তোমার রহস্যের কূপ ! ছিলাম তোমার পাশে আনন্দে-বেদনায় ! যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে আমি ছিলাম তোমার সহযাত্রী ! ছিলাম তোমার প্রাণ মাতানো কৌতুক আসরের সার্বক্ষণিক সঙ্গি! তোমার জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগলে আমার পালেও ধাক্কা দিয়েছে সে হাওয়া! বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখেও আমাদের বন্ধুত্ব ছিলো

অটুট অবিচ্ছিন্ন! আজ কেনো তবে তোমার এ দুঃসহ বেদনায় আমাকে শরীক করবে না? কেনো আজ আমাকে দূরে ঠেলে দেবে?'

আমি থামলাম। দেখলাম– আমার প্রিয় বন্ধু কাঁদছে! দু'টি 'মুক্তোদানা' তার চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। তার সুদীপ্ত পৌরুষ এখানে কোনো বাঁধ সাধলো না। একেবারে আমার চোখের সামনে এই অশ্রুফোঁটাদ্বয় ওর পৌরুষকে ব্যথিত করেছে বলেই মনে হলো। ওকে আর কখনো কাঁদতে দেখি নি। জানি না, এ অশ্রুফোঁটা বন্ধুর না ভগ্নিপতির। একটু পর ও বিড়বিড় করে কী যেনো বললো। ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দ এমন ছিলো যা পুরা বিষয়টি বুঝতেই আমাকে সহযোগিতা করলো। এরপর ওর মুখে আর কোনো জড়তা দেখলাম না। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ফোয়ারার মতো অশ্রু ছলোছলো দৃষ্টিতে আমাকে বলে যেতে লাগলো 'সভ্যদের' অসভ্যতার দাস্তান! তারপর তার উচ্ছ্বসিত কান্নার গমকে কথা আবার থেমে গেলো। না! এমন কান্না কোনো পুরুষকে আমি কাঁদতে দেখি
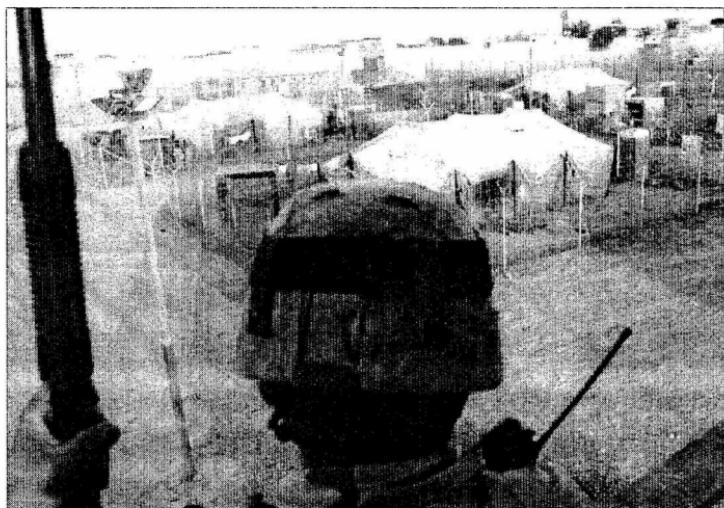
ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর হাজারো পাশবিকতার নীরব সাক্ষী
আবু গারিব কারাগারের বাইরের দৃশ্য

নি। ওর কথাগুলো আমার কাছে ভেঙে ভেঙে এবং থেমে থেমে আসলেও আমি সব স-ব বুঝতে পারছিলাম। এমনকি ও যা বলে নি, তাও বুঝতে পারলাম। আমি ওর আবেগ-অনুভূতির সাথে একাকার হয়ে মিশে গেলাম! যা যা ঘটেছিলো তা যেনো এখানে বসে আমিও দেখতে পাচ্ছিলাম! ঘৃণায় আমার দেহ-মন রি রি করে উঠলো!

ও আমাকে বললো–

'কল্পনা করো! একটা নারী সৈন্য অশ্লীল ভঙ্গিতে আমার নগ্ন দেহের উপর চেপে বসেছে! তার সঙ্গে আছে আরো একটা অনুরূপ নারী! সেও চেপে বসেছে আমার বসনমুক্ত কম্পিত দেহে! ওরা আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর অফিসার! লাঞ্ছনার এমন তিক্ত 'স্বাদ' জীবনে কোনো দিন চাখতে হয় নি! কসম আল্লাহ্‌র! কোনো দিন চাখতে হয় নি! বন্দিত্বের অসহায়ত্ব না থাকলে ইচ্ছে হয়েছিলো প্রহারে প্রহারে ওদের 'উচিত শিক্ষা' দিতে! ইচ্ছে হয়েছিলো নারী নামের এই 'নাপাকগুলোকে' হাজার বার কতল করতে! এই সর্ব অসহায়ত্বের ভিতরে বসে আমি কেবল কামনা করছিলাম 'মৃত্যু'! ভাবছিলাম– আমি যদি ব্যাপক বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্রের মতো বিস্ফোরিত হতে পারতাম! অথবা আমি যদি 'এর আগেই' জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যেতাম! আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পিশাচিনীরাসহ সবকিছু যদি জ্বলে জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতো! কিন্তু না! রাশি রাশি নীল বেদনার সর্বজ্বালা নিয়ে আমি বেঁচেই রইলাম!'

বন্ধুর মুখে এ কি শুনতে হলো আমাকে? স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি আবিস্কার করলাম যে, আমিও কাঁদছি! একটু আগে বন্ধুটি যেভাবে কাঁদছিলেন সেভাবেই! লজ্জায়-অপমানে মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো। তখন আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো– কাঁদছো কেনো বন্ধু, কাঁদছো কেনো? এই যে দেখো, তোমার ক্ষত থেকে যেমন রক্ত ঝরছে আমার ক্ষত থেকেও তেমন রক্ত ঝরছে! তোমার ক্ষত যে আমারই ক্ষত! কিন্তু চীৎকার দেবো কী করে? আমি যে তখন ভাসছি 'এক সাগর' অশ্রুতে! হ্যাঁ, একেবারে মহিলাদের মতোই গলা ফাটিয়ে কাঁদছিলাম। কাঁদছিলাম বেদনা ও লাঞ্ছনায়!

হে বেদনা! হে লাঞ্ছনা! কোমরে গাঁথা খঞ্জর হলে? আঘাত করলে আমার

মানে? যেমন আঘাত করেছো আমার বন্ধুর মানে?
হে ইঙ্গ-মার্কিন আধুনিক 'সভ্যতা'! এমন করেই বুঝি তুমি মানুষকে অবমাননা করো? মানবতার লাজ-বিনম্র ললাটে কলঙ্কের তিলক এঁকে দাও? প্রাণকে 'জড়বস্তু' বানাও? উচ্ছলময় জীবন্ত নগরীকে 'মৃতপুরী' ও 'বুতখানা' বানাও? ঝলসানো এই বাগদাদ নগরী এবং আমার এই ক্ষত-বিক্ষত বন্ধু কি তারই সাক্ষ্য বহন করছে না?

ও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। আমি জানি, ওর তূণীরে এখনো অনেক 'সংরক্ষিত বেদনা' অবশিষ্ট আছে। ওর ব্যথিত মুখাবয়বের আড়ালে। কিন্তু নীরবতা দ্বারা ও এখানে একটা বিরতি টানতে চাইছে। 'সভ্যতার চোরদের' কাছে নিজের শারিরীক লজ্জাস্থানগুলো অরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চুপির আড়ালে ও ঢাকতে চাইছে নিজের অভ্যন্তরীণ লজ্জাস্থানগুলো।

আমি তাই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম ওর শিশুদের দিকে। হয়ত সন্তানদের প্রসঙ্গ এলে ও একটু সান্ত্বনা পাবে। আমি নীরবতা ভাঙতে চাইলাম। দ্বিতীয়বার ওকে নাড়াতে চাইলাম। কিন্তু ও সাড়া দিলো না। আমার কথা মনে হয় শুনতেই পায় নি। নীরবতার নিঃসীম ভুবনে বসে মনে হয় আমাকে আর দেখতেও পায় নি।

আমি ওকে হলরুমটায় একা রেখে বেরিয়ে গেলাম। রাতের গভীর অন্ধকারে দিকভ্রান্তের মতো হাঁটতে লাগলাম। আমার কান্না মিশে গেলো আমার আর্তনাদের সাথে, আমার অন্যমনস্কতার সাথে, আমার বাকরুদ্ধতার সাথে, লাঞ্ছনা বয়ে বেড়ানো এক বিতাড়িত গৃহহীনের সাথে। নিজেকেই আমার কাছে অচেনা মনে হচ্ছে। আমি যেনো এক সংকীর্ণ গলিপথে এসে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। ধ্বংসের কোনো গোলকধাঁধায় যেনো ঘুরপাক খাচ্ছি। লাঞ্ছনার দাহনে দগ্ধ হতে হতে আমার মন চাইছিলো– হায়! আমি যদি আমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে কোনো দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে আমি ছাড়া অন্য কেউ হয়ত তা কাজে লাগাতে পারতো! চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ আমার এই বর্তমান অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারতো! আর তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী ও আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন

হলে প্রতিকারে কিছু একটা করতে পারতেন!

একরাশ ক্ষুব্ধ হতাশা আর একবুক চাপা বেদনা নিয়ে হাঁটছিলাম। ক্ষোভে-দুঃখে আমার তখন যে কী করুণ দশা তা বলার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু মনে হয়েছিলো; আমি বুঝি পৃথিবীতে নেই। ঢলে পড়ছি ক্রমে ক্রমে এক বেদনাদায়ক মৃত্যুর কোলে। অসহনীয় যাতনায় কেবল কাতরাচ্ছি। জীবনের তো অনেক প্রকার আছে, মৃত্যুর নেই? আমি তাহলে এখন কোন্ প্রকার মৃত্যুর কোলে দুলছি? কোন্ দিকে হাঁটছিলাম গভীর অন্ধকারে বুঝতে পারি নি। শুধু পৃথিবীটাই এখন অন্ধকার নয়– অন্ধকারে ছেয়ে আছে আমার অনুভব-অনুভূতির জগতটাও। তাই একটু পরই দেখলাম– আমি ঘুরে ফিরে আবার এসে হাজির হয়েছি বোনের বাড়ির সামনে। যেনো একটু আগেই আমি তা ছেড়ে গিয়েছিলাম। হলঘরটায় আলো জ্বলছিলো। ও তখনও ওখানে নীরব-নিশ্চুপ বসেছিলো। আমার মৃত্যুর চেয়ে ওর মৃত্যুটা কি আরো গাঢ়, ভয়ঙ্কর? ও কি আরো বেশী যাতনাগ্রস্ত?

আমার মাথাটাও এখন নিচু হয়ে আছে। ঝুঁকে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। পাগলের মতো বাড়ির দিকে হাঁটা ধরলাম। ওখানে কি আমার জন্যে আছে আলোর কোনো রেখা?

লেখিকা- লুবনা ইয়াসিন
সিরিয়া

কবি

এক.

কিছুক্ষণ আগে সূর্য উঠেছে। স্নিগ্ধ আলো প্রবেশ করছে দরোজা ও জানালার ফাঁক দিয়ে। একটু আগে মহাকবি জারিরের ঘুম ভেঙেছে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। অনেক আগেই ঘুম ভাঙা দরকার ছিলো। একটু রাগ করেই তিনি স্ত্রীকে বললেন–

'তুমি আগেই কেনো আমাকে জাগালে না? এতোক্ষণে তো আমার রাস্তায় থাকার কথা! আজ যে আমার নতুন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা .. তা কি তুমি ভুলে গেছো?'

স্ত্রী হেসে বললেন–

'ভুলে যাবো মানে! এমন সুযোগ বারবার আসে না! আপনি দ্রুত তৈরী হয়ে নিন। আমি এক্ষুণি নাস্তা দিচ্ছি। নতুন খলীফার শানে কী কবিতা বলবেন, ঠিক করেছেন কিছু? ছন্দ ও অন্ত্যমিল সব ঠিক আছে তো? নতুন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ কোনো মামুলি আদমি নন। আমি শুনেছি তাঁর রয়েছে ভালো কবিতা-জ্ঞান। তবে কবি ও কবিতা নিয়ে তাঁর যে দর্শন, সম্ভবত তা কবিদের কাউকেই সন্তুষ্ট করবে না।'

দুই.

জারির পরিচারককে দ্রুত গোসলের পানি দিতে বললেন। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'আমার মনে হয় না কোনো রাজা-বাদশাহ্ বা খলীফা কবি ও কবিতার সাথে দুশমনি রাখতে পারেন। কবিতা রাষ্ট্রের মুখপাত্র ও দর্পণ।

রাজনীতি বলো আর কূটনীতি বলো, বলো কার না কবিতার মতো ধারালো অস্ত্র প্রয়োজন?'

স্ত্রী বললো–

'অবশ্যই তিনি কবি ও কবিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু বেশি কিছু আশা করাও ঠিক হবে না।'

জারির আশ্চর্য হয়ে বললেন–

'মানে?'

'মানে হলো– কবিতা যা দেয় পেতে চায় তার অনেক বেশি। এ যেনো লম্বা একটা হাতের মতো। ধন-দৌলতের দিকে প্রসারিত হতে বড্ড নিশপিশ করে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ আল্লাহ্‌র এক পুণ্য বান্দা। তাঁর সবকিছুই আবর্তিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে। সুতরাং তাঁর খলীফা হওয়ার অর্থ হলো– কবিদের সূর্যের অস্তগমন আর আলেম-উলামার সূর্যের উদয়ন।'

জারির তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন প্রিয় স্ত্রীর দিকে। বললেন–

'দূর! তুমি কিছুই জানো না। আরবরা কবিতা ছাড়া নিজেদেরকে কল্পনা-ই করতে পারে না। কবিতা-ই যদি না থাকলো তবে সাম্রাজ্যই তো নিষ্প্রভ-দ্যুতিহীন। কবিতা সাম্রাজ্যেরই অংশ। সাম্রাজ্যের শৌর্য-বীর্য ছন্দ পায় কি কবিতার ছন্দ ছাড়া? কবিতার বর্ণিল প্রকাশ ছাড়া? পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো না!'

তিন.

না না করলেও জারির স্ত্রীর কথায় ভিতরে ভিতরে বেশ হতাশাবোধ করতে লাগলেন। এদিকে নানা জনের নানান কথাও বাড়িয়ে দিলো তার এই হতাশাবোধ। এভাবে হতাশার অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছিলো তার আশার আকাশ। নেমে আসবে কি শেষ পর্যন্ত ঘোর অমানিষা? না! হতেই পারে না। আবার তার আশার আকাশটা রাঙা হয়ে উঠে। 'আঁধার দূরে যায় পালিয়ে জাগে পাখির গান।'

জারির মনে মনে সংকল্প করেন। নতুন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ -এর শানে নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি করে শ্রেষ্ঠ নাজরানা লাভের স্বপ্নে তিনি

আপ্লুত হন। তাঁর সম্পর্কে যে যা-ই বলুক, তার বিশ্বাস হয় না। উমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন হিজাযের গভর্ণর ছিলেন, তখন তাঁর শাসন ছিলো ন্যায় ও কল্যাণে পরিপূর্ণ এবং ইনসাফ ও নূরে ভরপুর। তাঁর এই সোনালী শাসন গেঁথে গিয়েছিলো মানুষের হৃদয়ের গভীরে। যে কোনো সংকটেই ডাকতেন তিনি পরামর্শ সভা। যে কোনো সমস্যায় নিজেই ছুটে যেতেন তিনি উলামায়ে কেরামের সকাশে। সবার সাথেই ছিলো তাঁর গভীর সম্পর্ক। অপরদিকে যারা বিদ্রোহ করতো, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতেন তিনি বড়ো নির্দয়ভাবে। এমন মহান মানুষ কী করে জুলুম বা অন্যায় করতে পারেন অন্যদের প্রতি? তাহলে কবি এবং কবিতা কেনো বঞ্চিত হবে তার উদারতা থেকে?

সুতরাং খলীফার কাছে তাকে যেতেই হবে। অবিলম্বে। সাবেক খলীফা কবিদের নাজরানা দিতে দিতে রাজকোষ প্রায় খালিই করে ফেলেছেন হয়ত! তাই এক্ষুণি না গেলে ফিরে আসতে হবে শূন্য হাতে। নতুন খলীফাকে বরণ করে নেয়ার এই শুভলগ্নে তিনি নজরানা না পেলে পাবেন কি তবে কোনো শোক অনুষ্ঠানে?

চার.

খলীফার বাসভবনের উদ্দেশ্যে মহাকবি জারির এগিয়ে চললেন। মনে তার উড়ে বেড়াচ্ছে সোনালী আশার কতো পায়রা। কখন তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতার শ্লোকে শ্লোকে বরণ করে নেবেন নতুন খলীফাকে? কখন? আর কত দেরী?! কখন দাঁড়াবেন তিনি বনী উমাইয়ার মহান খলীফা, ন্যায়ের প্রতীক এই বীর পুরুষের সামনে?

মহাকবি জারিরকে অমন ঘটা করে নজরানার জন্যে খলীফার দরবারে যেতে দেখে কতো মানুষ বলছিলো কতো রকমের কথা। কেউবা ছুঁড়ে দিচ্ছিলো বাঁকা বাঁকা কথা। এক বেদুঈন যখন জারিরকে এসে বললো–

'জারির! আপনার জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, খলীফার দরবার থেকে আপনি কিছুই নিয়ে আসতে পারবেন না। মানুষের সামনে তাঁর

প্রথম ভাষণে তিনি কী বলেছেন জানেন? তিনি বলেছেন– ‘বনী উমাইয়ার খলীফারা তোমাদেরকে এমন অনেক ‘দান’ করেছেন যা নেয়া তোমাদের ঠিক হয় নি এবং তাঁদের দেয়াও ঠিক হয়নি। আজ আমি সে-সব সম্পদের হিসাব করবো এবং তা বাইতুল মালে জমা করবো! শুরু করবো আমার নিজের গৃহ থেকেই!’ জারির! এমন খলীফার কাছে আপনি তাহলে কী আশা বুকে নিয়ে যাচ্ছেন? কবিতা বলে তার মন ভোলাবেন বলে?! আমার মনে হয় না আপনি সফল হবেন! ইতিমধ্যে তিনি স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গিয়ে বাইতুল মালে জমাও দিয়ে ফেলেছেন! বনি উমাইয়ার এক দাপুটে ব্যক্তি এক খৃষ্টানের জমি দখল করে নিয়েছিলো। খলীফা খৃষ্টানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তার জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন! তাঁর এই শুদ্ধি-অভিযান থেকে কেউ-ই রেহাই পাচ্ছে না! এমনকি তাঁর চাচাতো ভাইরাও না!’

পাঁচ.

তবু জারির থামলেন না। এগিয়েই গেলেন। তার হতাশা বারবার পরাজিত হলো তার প্রচণ্ড আশার কাছে। কেউ তাকে ফিরাতে পারলো না। বরং নেতিবাচক যতো খবর তিনি শুনছিলেন পথের দু’ধারের মানুষের কাছে, তাতে নতুন খলীফা সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ও সম্মান আরো বেড়ে যাচ্ছিলো। বার বার তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তার হৃদয়-কাননে চোখ মেলে তাকাচ্ছিলো কলির পর কলি। সৌরভ ছড়াচ্ছিলো ফুলের পর ফুল। খলীফার দুনিয়াবিমুখতা ও মাহাত্ম্যের মাঝে তিনি দোষনীয় কিছুই খুঁজে পেলেন না। বরং তার বিশ্বাস, খলীফার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দুনিয়াবিরাগ ও চরিত্র-সুষমা অবশ্যই কবি ও কবিতার অসম্মান করবে না।

ছয়.

কবি জারির খলীফার মহলের সামনে গিয়ে থামলেন। কিন্তু ‘বাড়ি তো নয়– পাখির বাসা’ এর মতো মহল দেখে কবি বড়ো অবাক হলেন! ফটক আছে কিন্তু ফটকে নেই কোনো প্রহরীদল! নেই পুলিশ বাহিনীও! এক মহান খলীফার বাসভবন এমন কোলাহলশূন্য! এমন অনাড়ম্বড়! কী অদ্ভুত!!

জিন পরানো একটা ঘোড়া পর্যন্ত নজরে পড়ছে না! কোথাও নজরে পড়ছে না নতুন খলীফাকে বরণ করে নেয়ার কোনো আনন্দ-ছবিও! প্রাসাদের ভিতর থেকেও ভেসে আসছে না কোনো আনন্দ-সঙ্গীত! শোনা যাচ্ছে না কোনো বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজও!

কই! প্রাসাদের খিড়কি-পথেও তো দেখা যায় না কোনো আনন্দোচ্ছল মুখ? চারদিকে কেমন যেনো সুনসান নীরবতা! কী অদ্ভুত!!
এ যে ভাবাই যায় না!

জারির প্রাসাদের আরো কাছে গেলেন। দেখলেন ফটকে দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র প্রহরী। ভিতরে নেই কোনো কোলাহল। নজরে পড়ছে না রাজসিক কোনো জাঁকজমকও। শুধু মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছে পরিচারকদের নীরব আনাগোনা এবং আলিম-উলামার ধীর-স্থীর ও শান্ত চলাফেরা। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিলো খিলাফতের মসনদে যেনো কোনো পরিবর্তনই আসে নি। যেখানে যা যেমন ছিলো, সেখানে তা তেমনি আছে। অথচ উমর ইবনে আবদুল আজিজ খলীফা হয়েছেন জেনে জারিরের মনে হয়েছিলো যে সাম্রাজ্যের পুরো চিত্রটাই বুঝি এখন বদলে যাবে।

এ-সব ভাবতে ভাবতেই জারির ভিতরে যাওয়ার জন্যে দ্বাররক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দ্বাররক্ষী এগিয়ে এসে বললো–
'কী ব্যাপার? কাকে চান?'
কবি কিছুটা কড়া আওয়াজে বললেন–
'আমি কবি জারির। খলীফার কাছে এসেছি। তাঁর শানে প্রশস্তিমূলক কবিতা বলতে। আমাকে ভিতরে যেতে দাও।'
দ্বাররক্ষী বললো–
'না, ভিতরে যাওয়া যাবে না। খলীফার প্রাসাদে কবিদের প্রবেশের অনুমতিও নেই। তিনি কবিদের কবিতা শুনেন না। কবিতা নিয়ে মাথাও ঘামান না।'
প্রহরীর কথায় জারির বেশ অবাক হয়ে বললেন–
'কী বলছো! এমন কথা তো এর আগে কখনও শুনি নি!!'
'হ্যাঁ, মানুষের হক ও অধিকার এবং সমস্যা ও সমাধান নিয়েই মহান খলীফা

বেশি চিন্তা করেন ..। কবিতা আবৃত্তি ও কবিতা শ্রবণের চেয়ে এ-ই তো উত্তম!'

জারির হতাশ কণ্ঠে বললেন–

'খলীফা কি একসঙ্গে দুটিই করতে পারেন না? তিনি তো কবিতাও শুনতে পারেন এবং মানুষের উপকারও করতে পারেন!'

দ্বাররক্ষী শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো–

'তোমাদের কবিরা কথায় বড্ড পাকা কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকা। তোমরা ভালো-মন্দ বিচার না করেই যার কাছে দিনার পাও তাকেই প্রশংসার ডালি দাও। তার পায়েই প্রশস্তির অর্ঘ্য নিবেদন করো। তোমাদের সবকিছুই আবর্তিত হয় দিরহাম-দিনারের লোভে!'

দ্বাররক্ষীর কড়া কথা ও রূঢ় আচরণে জারির খুব ব্যথা পেলেন। বললেন–

'ভাই! তুমি মনে হয় কবিতার মর্মই বোঝো না! মানুষ আমাদের কবিতা শোনার জন্যে শুধু ইচ্ছুকই নয়, ভীষণভাবে লালায়িত। সব মানুষের মতো খলীফারাও শুনতে চান আমাদের কবিতা ও প্রশস্তিগাথা, তাই তাঁদের কাছেও আমরা উপস্থিত হই। কবিতা জীবনের কথাই বলে। কবিতা রাজ্যের অবস্থাকেই শুধু চিত্রিত করে। কবিতা জীবনবোধ ও সাম্রাজ্যেরই অংশ। এ থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। বেরিয়ে আসার কোনো পথও নেই।'

জারির আর কথা বললেন না। মন খারাপ করে একটু দূরে এসে এক জায়গায় নীরবে বসে ভাবতে লাগলেন–

কবিদের দিন কি তবে শেষ?

সত্যি কি এখন কবিতা হবে অবহেলিত, অবমূল্যায়িত?

তাও আবার ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার এই স্বর্ণ যুগে?!

কবিরা কি তাহলে এখন লাঙল আর কোদাল নিয়ে জমি চাষে নেমে পড়বে?

কিংবা দোকান খুলে বসবে?

চিরতরে বিদায় জানাতে হবে কি তাহলে কবিতার শিল্পময় ভুবনকে?

কল্পনার সুন্দর জগতকে?

বন্ধ হয়ে যাবে কি কবিতা পাঠের সোনালী আসর? ইন'আম ও নজরানার রূপালী জলসা?

সত্যি সত্যি কি নেমে আসবে কবি ও কবিতার উপর এমন অসুন্দর ঝড়?!

অবশ্য জারির একেবারে ভেঙে পড়লেন না। খলীফার সাথে দেখা করার আশাও ছেড়ে দিলেন না। বসে বসে তিনি দ্বাররক্ষীর উপর ফুঁসতে লাগলেন আর কী করা যায়– তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। চলতে লাগলো অপেক্ষার পালা। কাটতে লাগলো অপেক্ষার দুঃসহ প্রহর।

সাত.

হঠাৎ জারিরের দৃষ্টি পড়লো এক মশহুর মুফতি সাহেবের উপর। তিনি খলীফার মহলেই যাচ্ছিলেন। জারির প্রায় ছুটে এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে বললেন বড়ো কাতর কণ্ঠে–

يا أيها القارئ المرخي عمامته + هذا زمانـــك إني قد مضي زمني

أبلغ خليفتنـــا إن كنت لاقيه + إني لدي الباب كالمشدود في قرن

‘হে লম্বা পাগড়ী-পরা ক্বারী!
আমাদের ‘বসন্ত’ বিদায়! এখন তোমাদেরই ফুল ফোটাবার সময়!
তোমার সাথে খলীফার দেখা হলে তাঁকে একটু জানাবে কি
আমি এখানে বসে আছি নিরবচ্ছিন্ন অপেক্ষায় .. !!’

মুফতি সাহেব মৃদু হেসে কবি জারিরকে আশ্বস্ত করে ভিতরে চলে গেলেন। গিয়ে খলীফাকে বললেন–
‘আল্লাহ্‌র নবী কবিতা শুনেছেন এবং কবিদেরকে পুরস্কৃতও করেছেন। সুতরাং রাসুল যা করেছেন, আপনি তা বর্জন করতে পারেন না।’

খলীফা মুফতি সাহেবের কথা ফেলে দিতে পারলেন না। কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন এই বলে যে জারির তার কবিতায় কোনো মিথ্যা বলতে পারবে না।

আট.

এই শর্ত কবি হিসেবে জারিরের জন্যে বেশ কঠিন ছিলো। কেননা কবিতা

হলো শিল্প, কবিতা হলো মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে ওড়ে বেড়ানো, কবিতা হলো হৃদয়ের শত শত কল্পনার বর্ণময় আলপনা! তাই কবিতা যদি একেবারেই বাস্তবমুখী ও রসকসহীন হয়, তাহলে তা কি আর কবিতা থাকে? কী করবে জারির?

তবু চেষ্টা করতে হবে খলীফার শর্ত পুরোপুরি মেনে চলার। কারণ এতো অপেক্ষার পর লাভ হলো যে সুবর্ণ সুযোগ, তা কোনোভাবেই হারানো যায় না।

হায়! যে কবিতার ছবি এঁকেছেন তিনি মনে মনে, পথে পথে,
যে কবিতার ছন্দ এঁকেছেন তিনি মনের মাধুরি মিশিয়ে মিশিয়ে, সেই সুন্দর সুন্দর অন্ত্যমিলের রঙিন ভুবন থেকে এখন তাকে বেরিয়ে আসতে হবে?
আবার ভাবতে হবে সব নতুন করে? তাও আবার খলীফার 'শান মুতাবিক' এবং হতে হবে বর্ণে বর্ণে সত্যি?
এ যে ভীষণ কঠিন কাজ? কিন্তু মহাকবি জারির বেশি সময় নিলেন না।
কিছুক্ষণ ভেবে জারির আবৃত্তি করলেন–

إن الذى بعث النبى محمداً + جعل الخلافة فى إمام عادل

والله أنزل فى الكتاب فريضة + لابن السبيل وللفقير العائل

إنى لارجو منك خيراً عاجلاً + والنفس مولعة يحب العاجل

'নিশ্চয়ই যিনি পাঠিয়েছেন নবী মুহাম্মদকে তিনিই খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত
করেছেন আপনার মতো ন্যায়পরায়ণ ইমামের হাতে।
আল্লাহ কুরআনে বিবৃত করেছেন মুসাফির ও অসহায়-এর অধিকার
আমি চাই আপনার কাছে 'দ্রুত পুরস্কার'
মন আমার বড় ভালোবাসে দ্রুত কিছু পেতে!'

কবিতা বলা শেষ হলে খলীফা বললেন–
জারির! তুমি কোন্ বংশের মানুষ? আনসার না মুহাজির? তাঁদের কী হক ও অধিকার রয়েছে, তা আমি জানি এবং তুমি তাঁদের বংশের হলে তুমি তা-ই

'পাবে। আর দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাতারে যদি হও তুমি, তবে আমি সদকা ও যাকাত দিয়ে তোমাকে সহযোগিতা করতে পারি। আর যদি বলো যে তুমি মুসাফির, তাহলে এক মুসাফির হিসেবে তোমাকে যেভাবে সহযোগিতা করা দরকার তার সবই আমি করবো। ব্যবস্থা করবো তোমার জন্যে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার যাবতীয় আয়োজন। সওয়ারী না থাকলে সওয়ারী পাবে আর পথখরচ না থাকলে পথখরচও পাবে।'
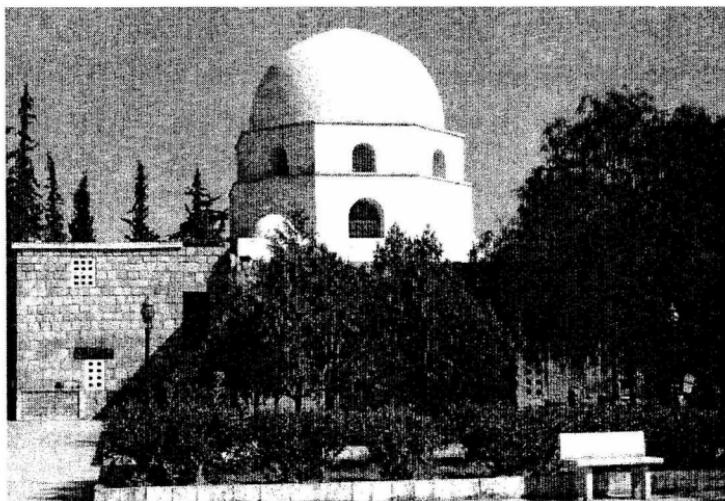
মাকবারায়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বাহির থেকে

খলীফার কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ জারির নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন হতাশ মন নিয়ে, কোনো জবাব না দিয়ে। ভাবলেন– আমি দাঁড়িয়ে আছি এমন মানুষের সামনে, যিনি দিরহাম-দিনার দিয়ে কবিতার লাইন কিনতে চান না। কবিতার অন্তর্নিহিত শব্দমালাও তাঁর মনকে নাড়া দেয় না। কবিতার ছত্রে ছত্রে বিবৃত কোনো উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিও তাঁর মনে ফুল ফোটায় না। সত্য ছাড়া তিনি কিছুই শুনতে চান না, এমনকি কবিতার শব্দালঙ্কারেও! একটু পর জারির মাথা তুলে তাকালেন মহান খলীফার দিকে। বললেন–

'খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি মুসাফির!'
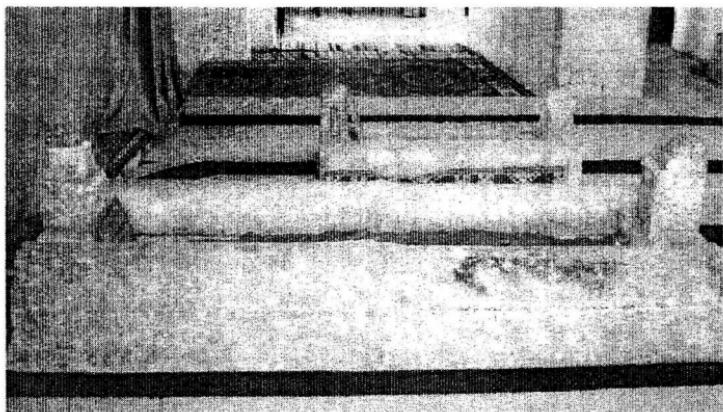
মাকবারায়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ভিতর থেকে

নয়.

কবি জারির যখন খলীফার মহল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন বাইরে অপেক্ষমান কবিরা তাকে ঘিরে ধরলো। সবাই সাগ্রহে জানতে চাইলো, কেমন করে খলীফার সাথে তাঁর দেখা হলো, কী কী কথা হলো এবং কী পুরস্কার তার লাভ হলো। জারির সবার দিকে তাকিয়ে বললেন–

'তিনি শুধু দরিদ্র, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের দান করেন, কবিদের জন্যে তাঁর কাছে 'কিছুই' নেই।' এই বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন কবি জারির নিজের ঠিকানায়। খলীফার মহলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কবিদের উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে বললেন–

'হে নিঃস্ব কবিরা! কবিতার রঙিন শব্দমালা পণ্য হিসেবে তাঁর কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়। এই পণ্য বিকিয়ে যদি নজরানা লাভ করতে চাও, তাহলে অপেক্ষা করো নতুন যুগের এবং নতুন খলীফার!'

তবে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে মহান খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের কথা ও আচরণে যে দীপ্ত প্রত্যয় দেখে এসেছেন জারির, তা শুধু তাকে মুগ্ধই করে নি, তার কবি মনকে দিয়েছে প্রশান্তিও! এই প্রশান্তি কি আগে কখনও লাভ করেছেন তিনি?

লেখক- নজীব কিলানী
মিশর

নীল বেদনার লাল গল্প

<u>জানুয়ারি ২০০৯ গাজা-ইসরাঈল যুদ্ধের</u>
<u>বীর শহীদানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত</u>

যুবকটি বাসে উঠতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। একটা শূন্য আসনে বসতেও পেরেছে। সাথে সাথেই সামনে এসে দাঁড়ালো ভাড়া আদায়কারী। কয়েকটা দিরহাম ওর হাতে তুলে দিয়ে সংক্ষেপে বললো–

'আল-কুদস!'

ভাড়া আদায়কারীর চোখে-মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো। চোখটা রূপ নিলো একটা গোলাকার 'বিস্ময়খানা'য়! বললো–

'জেরুজালেম?!'

যুবকটি তার দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার বললো–

'আল-কুদস!'

এবার ওর কণ্ঠ আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট, আরো দৃঢ়।

বাস চলতে লাগলো। যুবকটি বসে আছে নীরবে, সুস্থির ভঙ্গিতে। একটু পর সময় পার করার জন্যে ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বের করে চোখ বোলাতে লাগলো। আশ-পাশের কোনো কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। বাস এর মধ্যেই প্রবেশ করলো অধিকৃত ফিলিস্তিনী ভূ-খণ্ডে। হঠাৎ বাসটা থেমে গেলো। একটা 'চেকপোষ্ট' থেকে 'কয়েকটা' ইহুদী সৈন্য উঠলো। ওরা সবার ব্যাগ চেক করতে লাগলো। পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং কার কী পেশা– এ-সব খতিয়ে দেখতে লাগলো। যুবকটি প্রতিবাদ করলো। না, চীৎকার করে নয়– নিঃশব্দে, মনে মনে। মনকে লক্ষ্য করে ও বললো নিঃশব্দে, ঘৃণা

মেশানো শ্লেষাত্মক কণ্ঠে– 'তোদের বিতাড়ন বেশী দূরে নয়, অবশ্যম্ভাবী! কী আমাদের অপরাধ? কেনো এই অযাচিত তল্লাশি? নিজের দেশের সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার কি আমরা হারিয়ে ফেলেছি?! তোদের মতো একদল হায়েনার তাণ্ডবে?'

এক সময় শেষ হলো লাঞ্ছনাঘেরা মুহূর্তগুলো। শেষ হলো ওদের সুক্ষ্ম অমানবিক তল্লাশি। যুবকটি সতর্ক ছিলো। ওর কোনো সমস্যা হয় নি। আবার বাস চলতে লাগলো। যুবকটি হাত থেকে পত্রিকাটা ফেলে দিলো। আর ভালো লাগছে না। জানালা দিয়ে দেখতে লাগলো– পর হয়ে যাওয়া আপন ফিলিস্তিন! অনেক দিন পর দেখছে সে এই ফিলিস্তিনকে। চোখে ঝরে পড়ছে বেদনা। অনেক বেদনা। প্রিয় হারানোর বেদনা। দেশ বেদখল হওয়ার বেদনা। দেশের মানুষের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার বেদনা। নিষ্ঠুর পাশবিকতায় তাদের জীবন হারানোর বেদনা। আরো কতো বেদনা লুকিয়ে আছে এই চোখে, এই মনে। লাল বেদনা, নীল বেদনা। আঁকিয়ে ছবি আঁকলে যেমন গভীর করে তাকিয়ে থাকে পটের দিকে, ও ঠিক তাই তাকিয়ে রইলো পেছনে চলে যাওয়া-যাওয়া যয়তুন বৃক্ষের দৃশ্যাবলীর দিকে। কিংবা দীর্ঘ প্রবাস বা নির্বাস থেকে ফিরে আসা মানুষ যেমন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে স্বদেশের স্মৃতিময় দৃশ্য, ওভাবেই যুবকটি দেখছিলো সবকিছু।

বাস পৌঁছে গেলো সর্বশেষ ষ্টেশনে, আল কুদসে। সবাই নেমে যাচ্ছে। যুবকটিও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে দরোজার দিকে। শূন্য হাতে। ব্যাগটা ইচ্ছে করেই কি ফেলে যাচ্ছে! বাস চালক ব্যাগটার কথা মনে করিয়ে দিলেও 'হাঁ-না' কোনো স্পষ্ট উত্তর দিলো না ও। আপন মনে ফিলিস্তিনের কথ্য ভাষায় বিড়বিড় করতে করতে নেমে গেলো । যার মর্ম ছিলো– একটা ব্যাগ আর কতো বয়ে বেড়াবো?

যুবক গন্তব্যের দিকে চলা শুরু করলো। ফুটপাতে নেমে প্রাণভরে শ্বাস নিলো। কতো দিন পর ও ফিলিস্তিনের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। আহা, কী শান্তি! একটু পর যুবকটি ঘড়ির দিকে তাকালো। যেনো কোনো প্রতীক্ষায় ওর সময় বয়ে যাচ্ছে। কিংবা কারো সাথে নির্দিষ্ট ক্ষণে ওর দেখা হওয়ার

কথা রয়েছে। যুবক পথ চলতে লাগলো। ওর প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি চাহনিতে ঝরে পড়ছিলো তারুণ্যের উত্তাপ ও দৃঢ়তা। ওর চলার বেগময়তা বলে দিচ্ছিলো– নিজের গন্তব্য কোথায়– তা ওর ভালোই জানা আছে। কিংবা কী উদ্দেশ্যে তার এ পথচলা– তা সে ভালো করেই জানে। ক্ষণে ক্ষণে সে আশ-পাশে তাকাচ্ছিলো। কী যেনো ভেবে, কীসের যেনো খোঁজে অথবা এমনিতেই আনমনে। মাঝে মধ্যেই চোখ পড়ছিলো আশ-পাশে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ইহুদী সৈন্যদের উপর। ওরা মাটির মতো সারা জেরুজালেমে ছড়িয়ে আছে। এরা জননিরাপত্তা কিংবা জেরুজালেম শহরের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। এদের কাজ– কেবল হত্যা, কেবল লুণ্ঠন, কেবল ধ্বংস, কেবল রক্ত ঝরানো! শিশু রক্ত, নারী রক্ত, অসহায় বৃদ্ধ রক্ত! টগবগে তাজা রক্ত ঝরাতে ওরা ভয় পায়। তাজা তরুণ প্রাণের কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতে কোনো কালেই ওরা সাহস পায় নি, আজো পায় না। ফিলিস্তিনের এক ছোট্ট শিশুর একমুঠো পাথরকণা ওদেরকে বন্দুক ও মেশিনগান নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এ দৃশ্য ফিলিস্তিনের আকাশ বাতাস অনেক বার প্রত্যক্ষ করেছে। ওর সামনে যখনই কোনো ইহুদী সৈন্য পড়ছিলো, একরাশ ঘৃণা নিয়ে, অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে এবং 'আহত আরবের প্রত্যাখ্যান ও তার লুণ্ঠিত ইজ্জতের লজ্জা-ভার কাঁধে নিয়ে' ও তাদের দিকে তাকাচ্ছিলো।

বাঁকটা এখনো অনেক দূরে। বাঁকটা পেরিয়ে একটু ভিতরে ঢুকলেই ওদের ছোট্ট বাড়িটা। বাড়ির আঙ্গিনায় ওর আব্বা একটা ছোট্ট বাগান করেছিলেন। নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন কতো গাছ। কমলা লেবু, যায়তুন ও ইয়াসমিনসহ আরো অনেক গাছ। যা যা সম্ভব ছিলো। এই বাগানটাই ছিলো ওর আর ওর বোনের খেলার প্রিয় জায়গা। হ্যাঁ, দূরত্বটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ওর নাকে যেনো ঘ্রাণ এসে লাগছে ঐ ছোট্ট বাগানটার। আহ, কী মিষ্টি ঘ্রাণ! .... ও আশপাশে আবার তাকালো। হুঁ, দু'টি চোখ ওকে অনুসরণ করছে। একটা ইহুদী সৈন্য। ওর সামরিক পোশাকে খচিত অনেকগুলো তারাকা-চিহ্ন। এটাই ইসরাইলী সৈন্যদের 'ইউনিফর্ম'-প্রতীক। কিন্তু এই 'অভিশপ্তের বাচ্চা অভিশপ্ত' তার পিছু নিলো কী কারণে?!

হঠাৎ পেছন থেকে সৈন্যটা চীৎকার করে উঠলো– 'থামো! আর এক কদমও সামনে বাড়ার চেষ্টা করবে না!!' যুবকটি থেমে গেলো! ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো নিষ্ঠুর সৈন্যটার চেহারায়! সৈন্যটা একেবারে নিকটে এসে আবার চীৎকার করে উঠলো– 'জলদি কাগজ-পত্র বের করো এবং মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো!' অতীত স্মৃতির নৌকাটা এবার তাকে বয়ে নিয়ে গেলো বাঁকের পর সেই ছোট্ট গলিটিতে। ওর মনে পড়ছে, ঠিক এ ধরনের কথাই ও এবং ওর ছোট্ট পরিবার শুনেছিলো মাতৃভূমির মাটিকে .. ওদের ছোট্ট বাড়িটিকে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়ার আগ-মুহূর্তে। সময়ের চাকাটা যেনো ওর অতীত স্মৃতির দোরগোড়ায় এসে থেমে গেলো! যুবক কল্পনায় ফিরে গেলো সেই বাঁকটায়, ওদের সেই ছোট্ট গলির পাশের ছোট্ট বাড়িটায়। ও আর ওর বোন ছোট্ট বাগান থেকে জুঁই ছিঁড়ে ছিঁড়ে কতো মালা গেঁথেছে তারপর সে মালা পরিয়ে দিয়েছে মায়ের গলায়! মাকে মাল্য-ভূষিত করতে ওদের ভীষণ ভালো লাগতো। তখন মাকে মনে হতো যেনো ফুলের রানী। আহ! এখন ইয়াসমিন (জুঁই) গাছটা আর নেই! ইহুদী হাতের নিষ্ঠুরতা তাকে শেষ করে দিয়েছে! আর ছোট্ট বোনটা?!! বয়স ছিলো যার মাত্র ছ'বছর? যার চুলের দু'টি ছোট ছোট বেণী এখনো ভেসে বেড়ায় তার চোখে অনুভবে? ও কোথায়?!! ও বর্বর ইহুদীদের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো! অকালেই ঝরে পড়েছিলো ওর জীবন-কলি! বাবা?! না, এখন বাবাও নেই! ইহুদীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে তিনি শহীদ হন! বাবার চেহারাটা এখন খুব বেশী করে মনে পড়ছে ওর! বাবা যখন ওদের ছোট্ট জমিতে কাজ করে শ্রম-ক্লান্ত ও ঘাম-সিক্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন, তখন বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগতো ওর। ইচ্ছে হতো তাকিয়েই থাকতে। মনে হতো তাঁর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম যেনো দানা দানা মুক্তা! বাবাকেও ইহুদীরা মেরে ফেলে! হ্যাঁ, মায়ের মুখটাও চোখের সামনে ভাসছে। মা যেনো আগের মতোই এখন ওর মুখের দিকে মিষ্টান্ন- ধরা হাতটা এগিয়ে আনছেন! বড়ো ভালোবাসতেন তিনি মিষ্টি। কম ভালোবাসতেন খেতে, বেশী ভালোবাসতেন খাওয়াতে! জীবনের একেবারে শেষ বেলায় মা অনেক কেঁদেছিলেন! মৃত্যুর ভয়ে তিনি কাঁদেন নি, কেঁদেছিলেন তাঁর ছোট্ট সোনার সংসারটা ইহুদীদের হাতে তছনছ হয়ে যেতে

দেখে! মা এখন কোথায়?! নেই! মা নেই!! এখন পরিবারের কেউ নেই!! বেঁচে আছে শুধু ও একা! মাকেও ইহুদীরা গুলি করে হত্যা করে!! থামিয়ে দেয় তাঁর জীবন-স্পন্দন!! মমতা-ভরা মাতৃ হৃদয়ের এমন নিষ্ঠুর জীবন-নাশ– পারে শুধু ইহুদীরাই!! মমতা আর ভালোবাসার ছায়ায় বেড়ে ওঠা পরিবারটি এখন নিঃস্ব! মৃত্যুকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু তার একটি ডাল! আর বাড়িটা?! বিরান, শূন্য!! বাগানটা?! না, গাছ নেই! ফুল নেই! নেই পাখির কূজনও!! ইহুদীরা আগ্নেয়াস্ত্রের তাণ্ডবে স-ব শেষ করে দিয়েছে!! এখন তা যেনো এক মৃত্যুপুরী! ওরা শুধু মানবতার দুশমন না, প্রকৃতিরও দুশমন।

পরিস্থিতি যে এমন বিপজ্জনক বাঁকে মোড় নিতে পারে তা ওর অজানা ছিলো না। তাই ব্যাগটা বাসে রেখে এলেও পিস্তলটা আছে ওর পকেটেই। এখন পিস্তলটাই ওর বেশী প্রয়োজন। কিন্তু সামনে দণ্ডায়মান জীবন্ত দানবটাকে পিস্তলটা যে আছে– তা মোটেই বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাহলে প্রতিশোধ নেয়ার স্বপ্নটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। 'অপারেশন প্রতিশোধ' অসমাপ্ত থেকে যাবে। ও সৈন্যটার দিকে দৃশ্যত বোকা বোকা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো আর পিস্তলটা বের করার একটা সুযোগ খুঁজছিলো। অনেক কষ্টে ও পিস্তলটা কিনেছে। ভাঙতি পয়সা জমিয়ে জমিয়ে। এক সময় মনে হয়েছিলো, পিস্তল বুঝি আর কেনা হলো না! ভাঙতি পয়সা জমিয়ে আর যাই হোক পিস্তল কেনা হয় না! কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। এখন ও একটা 'আধুনিক' পিস্তলের বাহক। শুধু তাই নয়– বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে সেই 'অসম্ভব'কে সাথে নিয়ে এখানে আসতেও সক্ষম হয়েছে ও, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে মানব শয়তানটা। এই শয়তানটাকে বধ করতে পারলে স্বার্থক হবে পিস্তল কেনা। সফল হবে ওর 'অপারেশন প্রতিশোধ'। একে বধ না করে কোনো উপায়ও নেই। কেননা এ শুধু কাগজ-পত্র দেখেই ক্ষান্ত হবে বলে মনে হয় না। বরং তাকেও পরিবারের অন্য সবার মতো মেরে ফেলবে। সুতরাং মরতে হলে মরবে কিন্তু আগে একে মারবে। তা ছাড়া মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই। মৃত্যু তো তার অনেক আগেই হয়ে গেছে! যেদিন পরিবারের সবাইকে এক এক করে হত্যা করা

হয়েছে, সেদিনই ওর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। এখন বেঁচে আছে শুধু ওর দেহটা। 'প্রাণহীন' এ দেহটা নিয়ে কতো আর লক্ষ্যহীন পথচলা? হ্যাঁ আর দেরী নয়, এক্ষুণি জ্বলে উঠুক প্রতিশোধের গোলাবারুদ! পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার এমন শুভক্ষণ আর আসবে না! জীবনের কোনো অর্থ নেই– দেশ ছাড়া, লক্ষ্য ছাড়া, স্বজন-সুজন ও পরিবার ছাড়া!

ওর একটা হাত পকেটে ঢুকে গেলো! পিস্তলের শীতল স্পর্শে হাতটা নিশপিশ করে উঠলো! ও তাকালো সৈন্যটার চোখে চোখ রেখে। কিছুক্ষণের জন্যে যেনো জ্বলে উঠলো চোখের তারা দু'টি। অতীত স্মৃতিগুলো আবার ভেসে উঠলো একের পর এক। স্মৃতির ফিতাটা ঘুরছে। বোনের শাহাদতের দৃশ্য! বাবার শাহাদতের দৃশ্য!! মায়ের শাহাদতের দৃশ্য!! অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের শাহাদতের দৃশ্য!! মামা, চাচা, মামাতো-চাচাতো ভাইয়েরা, খালা, ফুপু, খালাতো-ফুপাতো ভাইয়েরা এবং প্রতিবেশিরা– সবার ছবি একে একে ভেসে উঠছে তার স্মৃতির স্বচ্ছ আয়নাটায়! কাউকেই ওরা রেহাই দেয় নি! ওদের নিষ্ঠুর পাশবিকতা কেড়ে নিয়েছে সবার তরুতাজা প্রাণ! নির্দয়ভাবে, অন্যায়ভাবে!

হঠাৎ আশ্চর্য দ্রুততায় পিস্তলটা বের করে সব কটা গুলি দাম্ভিক অহঙ্কারী ইসরাইলী সৈন্যটার পেটে খরচ করলো যুবক!! নিমিষেই তার দম্ভ ও অহঙ্কার মিশে গেলো মাটির সাথে। ওর নাপাক লাশটা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে 'খাক ও খুন'-এর মাঝে। যুবক শান্ত দৃষ্টিতে দেখলো পিশাচ সৈন্যটার রক্ত। যা মোটেই ওর পরিবারের রক্তের মতো লাল নয়, বরং কুৎসিত, কদাকার, যেনো প্রাণময় ও উজ্জীবিত, উদ্যানে উদ্যানে সৌরভময় ও শ্যামলিমাময় ফিলিস্তিনের অসংখ্য জ্বালিয়ে দেওয়া ঘর-বাড়ির কালো কয়লা-মেশানো তা। পাশাপাশি তাতে আরো মেশানো আছে ইহুদীদের হিংসা, কপটতা, অমানবিকতা, পৈশাচিকতার কালো রঙ।

এ-সব চিন্তা ওর মনে একদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, অপরদিকে প্রতিশোধ নিতে পারায় ওর চোখ দু'টি চিকচিক অশ্রুকণা ফেলে ফেলে নাপাক রক্তে একাকার হয়ে পড়ে-থাকা ঐ সৈন্যটার নিথর লাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

আনন্দ প্রকাশ করছিলো। হঠাৎ ও অনুভব করলো একঝাঁক আগুনের ফুলকি যেনো ওর গায়ে এসে ঝলসে দিলো জায়গাটা! রক্তে ভিজে যাচ্ছে পরনের কাপড়! বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না! মাটিতে লুটিয়ে পড়লো যুবক!

কিন্তু মনটা এখনো ওর অনেক শক্ত। অভিযান শেষ করতে চায় ও। সুতরাং সামনের বাঁকটাকে লক্ষ্য করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলো সামনে। যেতেই হবে। যে করেই হোক বাঁকটা পেরিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। ওখানে শুয়ে থাকা আব্বু-আম্মুকে আর ছোট্ট বোনটিকে বলতে হবে– আমি এসেছি! আমি কথা রেখেছি! তোমাদের সবার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে এসেছি!!

অনেক কষ্টে চলতে লাগলো ওর দেহটা– পথে ছড়িয়ে দিয়ে শাহাদতের লাল রক্ত! আহা! এ পথে আগে কতোবার ও আসা-যাওয়া করেছে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে কতো না স্মৃতি! এখানকার বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায় ভাই-বোনের এক সাথে পথচলার কতো কলকল শব্দ! হ্যাঁ, মিশে আছে আরো তাঁদের রক্তের ঘ্রাণ। এই যে নাকে এসে লাগছে!

অনেকটাই কাছে চলে এসেছে ও! আরেকটু! তাহলেই চোখে পড়বে বাড়িটা। বাঁকটা এখন পেছনে ফেলে একেবারে বাড়ির ভাঙা দেয়ালটার কাছে চলে এসেছে ও! ওর কোনো মাদ্‌রাসা ছিলো না। এই দেয়ালটাই ছিলো ওর মাদ্‌রাসা। এখানেই চলতো আঁকাআঁকি! ঐ মাদ্‌রাসাটা স্পর্শ করতে আর কতো দেরী! দূরত্ব একেবারেই সামান্য। কিন্তু নিস্তেজ হয়ে আসছে প্রায় রক্তশূন্য দেহটা! শেষ পর্যন্ত কি স্পর্শ করা হবে না? তাহলে অনেক ইচ্ছেই যে অপূর্ণ থেকে যাবে! আল্লাহ! আরেকটু সময় দাও! তুমিই তো হায়াত-মওতের মালিক!

হঠাৎ মনে হলো একটা কণ্ঠ ওকে ডাকছে! হ্যাঁ, এ যে বোনটার কণ্ঠ! 'ভাইয়া! তুমি চলে এসেছো! এবার একটা ঝাঁপ দাও! দেয়ালটা ধরে দাঁড়িয়ে যাও! তাহলেই আমাদেরকে দেখতে পাবে .....!!'

আল-হামদুলিল্লাহ! ও দেয়ালটাকে স্পর্শ করতে পেরেছে! কী আনন্দ! কী খুশি!! এ কি মিলনের আনন্দ? না প্রতিশোধের আনন্দ? না কথা রাখার আনন্দ? .. ও নিজের রক্তে দেয়ালে লিখতে শুরু করলো! কী লিখবে? লেখা-পড়া তো করাই হয় নি! একবারের জন্যেও মাদ্‌রাসায় যাওয়া হয় নি। তবে ও প্রিয় জিনিসগুলো লিখতে পারে! প্রিয় জিনিস শিখতে সময় লাগে না, কষ্টও হয় না! ও লিখতে পারে 'মা!' আরো লিখতে পারে 'ফিলিস্তিন!' এখন কী লিখবে? ফিলিস্তিনটাই লিখবে! শুরু হলো লিখা 'ফি লি স্.... ! না আর পারা গেলো না! এই মাত্র নিভে গেছে 'প্রদীপ'টা!!

(হে রক্তময় গাজা! দানব দেখে ভয় পেয়ো না! লড়ে যাও! তোমার বুকে লেখা আছে এই যুবকের মতো এবং এই যুবকের পরিবারের মতো শত শত শাহাদতের লাল দাস্তান!)

লেখিকা- লুবনা ইয়াসিন
সিরিয়া

তাবুকের ডাক

এক

হাতে গোনা কয়েকটি বছর। ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে– সে আর ক'দিন? হেরা গুহা থেকে দারুল আরকাম। দারুল আরকাম থেকে কা'বা চত্বর। গোপন দাওয়াত থেকে প্রকাশ্য দাওয়াত। তারপর দশ বছরের একটা ছোট্ট সিঁড়ি পেরিয়ে যাত্রা হলো মক্কা থেকে মদীনায়। মক্কী জীবনের দশটা বছর অনাচার-অত্যাচারে, জুলুম-নিপীড়নে ঢাকা থাকলেও মদীনায় এসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আলোকোদ্ভাসিত। মহিমান্বিত। এর মধ্যে এসেছে বদর। দিয়েছে গৌরবময় বিজয়। এসেছে ওহুদ। দিয়েছে ত্যাগময় বিজয়। এসেছে খন্দক। দিয়েছে মহিমান্বিত বিজয়। এসেছে মক্কা-অভিযানের মহালগ্ন। মূতা অভিযানের কঠিন মুহূর্ত। হোনায়নের মহা পরীক্ষা। বিজয়ও এসেছে সাথে সাথে। একটু পর আসবে তাবুক। পরাশক্তি রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা এসেছে মসজিদে নব্বী থেকে। বাতিল যখন হককে মিটিয়ে দেয়ার শপথ নেয় তখন বাতিলকে প্রতিরোধ করে তার বিষদাঁত ভেঙে দিতে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। তাই মদীনা এখন প্রস্তুত। আরব উপদ্বীপ থেকে সোজা দক্ষিণে সুসজ্জিত রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে এখন যাত্রা করবে ত্রিশ হাজার জানবাজ মুজাহিদ। হকের বীরোচিত কাফেলা।

হায়! সময় কী বিস্ময়করভাবেই না পাল্টে যায়! সেদিনই না মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এবং নির্যাতিত সাহাবীরা! সবকিছু পেছনে ফেলে! শুধু ঈমানকে সামনে রেখে! দেশের মায়া আর সম্পদের ছায়া তুচ্ছ ভেবে! ঈমান

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে– কী হবে দেশের মায়া দিয়ে? সম্পদের ছায়া মাড়িয়ে? ঈমান বড় না দেশ বড়? আদর্শ বড় না সম্পদ বড়? এমন আলোকিত চেতনার মানুষের সামনে যদি আসে বদর-ওহুদ-খন্দক-মূতা'র পর 'মহা তাবুক', তাহলে বিস্ময়বোধ করা কি ঠিক হবে? এমন চেতনার মানুষের নবীর সামনে যদি দেশের পর দেশ 'স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগতিকতায়' দেশের কপাটের সাথে সাথে নিজেদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাটটাও খুলে দেয়, তাহলেও কি কারো বিস্মিত হওয়া ঠিক হবে?

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেনো আজ বিশাল এক 'পর্বত'। যোদ্ধা-জাতি রোমকদের মুকাবিলার জন্যে তিনি এখন যাত্রা করবেন মরুর পর মরু পেরিয়ে। হাজির হবেন গিয়ে একেবারে তাদের দোরগোড়ায়। অথচ তখন সময়টা ছিলো বড়ো অসময়। প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রোমক বাহিনী। পথ ছিলো যেমন দূরের তেমনি কষ্টের। মওসুমও ছিলো প্রচণ্ড গরমের। সাহাবীদের কাছে ছিলো না প্রয়োজনীয় সওয়ারী ও অর্থকড়ি। তা ছাড়া সময়টা আরো ছিলো গাছে গাছে ফল পাকার। নতুন ফসল ঘরে তোলার। এই নাজুক ও প্রতিকুল পরিস্থিতিতে যখন ডাক এলো জিহাদের, হাতে হাতে তলোয়ার উঠানোর, সেরা সমর শক্তির সামনে দাঁড়াবার, সাহাবীরা 'লাব্বাইক' বলতে একটুও দেরী করলেন না। একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। রাসূলের আহ্বানের সামনে কিসের আবার দূরের পথ, কষ্টের পথ? রাসূলের আহ্বানের সামনে কিসের আবার পরাশক্তি, মহাশক্তি? রাসূলের আহ্বানের সামনে কিসের আবার ফল-ফসলের মায়া, গাছ-গাছালির ছায়া? রাসূলের আহ্বানের সামনে কিসের আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাবাভাবি? তাঁরা তো ঈমান এনেছেন দুনিয়ার মায়াকে বিসর্জন দিয়ে রক্তমূল্যে হলেও পরকালকে খরিদ করতে! তাঁরা তো ঈমান এনেছেন– যে কোনো কঠিন, ভয়াবহ ও নাজুক পরিস্থিতিতেও বীর বিক্রমে লড়াই করতে করতে শাহাদতের লাল গালিচায় লুটিয়ে পড়ার জন্যে! সুতরাং এই অসময়েও যাত্রা হবে আল্লাহ্‌র রাসূলের নেতৃত্বে রোমক বাহিনীর দেশে, তাবুকের ময়দানের দেশে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রাসাদের দেশে, ইসলামের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদানকারীদের দেশে!! রোমকরা যদি সত্যের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে, সত্য ও স্বাধীনতা

এবং ন্যায় ও স্বাধিকারের টুটি চেপে ধরে 'তাহলে ইসলামের বীর সন্তানরা তো নীরবে বসে থাকতে পারেন না!

দুই

গরমে হাত পা পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। ঊষর মরুর বালিরাশি আর পাথরকণাগুলো যেনো জাহান্নামের এককেটা পিন্ড। এমন বেরসিক প্রকৃতির 'ছাতা' মাথা নিয়েই বিশিষ্ট সাহাবী আবু খায়সামা মদীনার অদূরে হাঁটছিলেন। হৃদয়ে অশান্তির ঝড়। চোখে উদভ্রান্ত মানুষের দৃষ্টি। গৃহ-পানে হেঁটে যাচ্ছেন কেমন এলোমেলোভাবে। নির্বিকার ভঙিতে। আগুনঝরা রোদ্দুর যেনো গায়েই লাগছে না। কী হয়েছে আবু খায়সামার? কেনো মদীনার এই 'সুখী সাহাবী'র মনে এখন সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই? সবাই যেখানে তাবুক অভিযানের মহা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সেখানে আবু খায়সামা কেনো ঘুরে ফিরছেন অশান্তি ও অস্থিরতার দুঃসহ উপত্যকায়?

আবু খায়সামা আসলে বড় রকমের বিপদে পড়েছেন। আটকা পড়েছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটা শক্ত জালে। তিনি এখনো জানেন না– তাবুকের ডাকে সাড়া দেবেন না দেবেন না। বিবেকের ডাকে 'লাব্বাইক' বলবেন না বলবেন না। এখনো তিনি দুলছেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে। অথচ একটু আগেও তাঁর মন ছিলো শান্ত প্রশান্ত। আর এখন বিকেক ও প্রবৃত্তির লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। একবার বিবেক এসে হাজির হচ্ছে তাঁর কাছে তাবুকের ডাকে সাড়া দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু পরক্ষণেই প্রবৃত্তি এসে তাঁর সামনে সুন্দর সুন্দর যুক্তির আড়ালে বিছিয়ে দিচ্ছে দ্বিধার জাল।

বিবেক বলছে–

'আবু খায়সামা!

কী হয়েছে তোমার?

কোথায় তোমার উজ্জীবিত জিহাদী চেতনা?

স্বাস্থ্য-শক্তিতে তুমি তো বেশ শক্ত সুঠাম!

আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন অঢেল ধন-সম্পদ ও নয়নপ্রীতিকর স্ত্রী-সন্তান!

সন্তানদের প্রাণময় ছুটোছুটি ও মায়াময় কলরোলে তোমার চোখ হাসে, তোমার মুখ হাসে!
সাথে সাথে হাসে আকাশের ঐ রূপালি চাঁদটাও!
আনন্দে-আহ্লাদে-স্বপ্নে ভরে যায় না কি তখন তোমার মনোজগত?
তোমার দু'স্ত্রী কি তোমার একাকীত্ব ও শূন্যতাকে ভরে দেয় না– মিষ্টি হাসির আলপনা এঁকে এঁকে,
রূপ-লাবন্যের সুষমা ছড়িয়ে ছড়িয়ে,
প্রেম-ভালোবাসার ফুলে– মালা গেঁথে গেঁথে?
মদীনার বুকে দাঁড়িয়ে আছে সুদৃশ্য খর্জুরবীথি ও উদ্যান-বেষ্টিত তোমার এই সুন্দর বাড়িটা।
সবুজ-শ্যামলিমার এমন স্নিগ্ধ পরশ,
ফলদার-ছায়াদার বৃক্ষের এমন সমারোহ–
মদীনাতে আর ক'জনের আছে বলো?
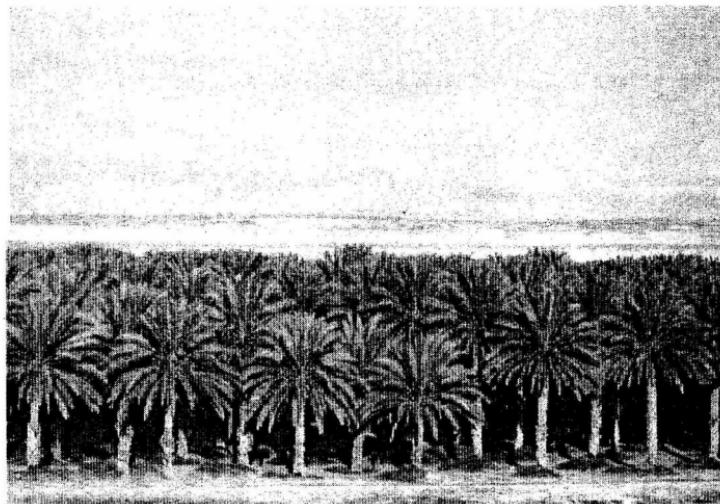
তাহলে কী তোমার সমস্যা?
কেনো এই দ্বিধা?

কেনো তোমার এই বসে থাকা– নির্জীব-নির্বিকার?
জিহাদের দামামা কি বেজে উঠে নি?
সমস্ত সাহাবীই তো জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এবং আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞায় সঞ্জীবিত হয়ে একটু পরই ছুটে যাচ্ছেন তাবুক পানে!
তবুও তুমি কেনো একলা পড়ে থাকবে এই 'বীরশূন্য' মদীনায়? এই রাসূলশূন্য মদীনায়?
এর আগে যখনই এসেছে তোমার কানে জিহাদের ডাক,
দাও নি কি সাড়া– স্বতস্ফূর্ত ব্যাকুলতায়?
তরবারী হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো নি কি শাহাদত লাভের ঐকান্তিক কামনায়?
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া দিয়ে চিরস্থায়ী আখেরাত খরিদের স্বপ্নময়তায়?
তাহলে আজ কেনো কথা বলে উঠছে না তোমার জিহাদী জযবা? তোমার ঈমানী চেতনা?
তোমার শহিদী তামান্না?
এই আবু খায়সামা! বলো না, কী হয়েছে তোমার?!

তিন.

বিবেকের পাশে এলো প্রবৃত্তিও। সেই অন্ধকার রাতের কথা কখনো আবু খায়সামা ভুলতে পারবেন না। ইস! কী কষ্ট হয়েছিলো তাঁর– সে রাতের ব্যর্থতার স্তূপগুলো অপসারিত করতে! সে ছিলো কী যে লজ্জাকর দুদোল্যমানতা! আবু খায়সামার পরিস্কার মনে পড়ছে– কীভাবে শয়তান তার মনে ঢেলে দিয়েছিলো কূ-মন্ত্রণা– সুন্দর সুন্দর যুক্তির আড়ালে–
'আবু খায়সামা!
মুহাম্মদ এবং রোমানদের যুদ্ধ–
সে কি সাধারণ কোনো যুদ্ধ!
তাও আবার যুদ্ধবাজ রোমকদের দোরগোড়ায় গিয়ে!
পেরিয়ে যেতে হবে কতো মরুভূমি,
পেছনে ফেলে যেতে হবে কতো বালিয়াড়ি!
রাস্তায় কেটে যাবে কতো দিন-রাত।

আর কষ্ট! ভাবলেই মনে হয়–
যেনো চোখের সামনে পাহাড় দুলে উঠছে।
পদে পদে বিপদ।
মুহূর্তে মুহূর্তে শংকা।
তা ছাড়া তায়েফ-অভিযান কেবলই না শেষ হলো!
এখনো তো সাহাবীরা তরবারীগুলোই খাপে রাখার অবকাশ পান নি!
ঘোড়াগুলোও তো আস্তাবলে ভালো করে একটু বিশ্রাম নেয় নি! এরপরও একান্তই যদি জিহাদের ডাক এসে যায়,
তাহলে তুমি আবু খায়সামা একা না গেলে কিইবা এসে- যায়? জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার মতো সৈনিকের তো এখন মদীনাতে কোনো অভাব নেই!'

আবার এলো বিবেক। এসে চোখ রাঙিয়ে বললো–
'আবু খায়সামা! এমন করে ভাবতে পারলে তুমি?
এমন ঠুনকো যুক্তির কাছে কোনো বীর কি হার মানতে পারে? সবাই যাবে আর তুমি বসে থাকবে–
এ কি তোমার মতো এক বীরের কাছে সহনীয়?
'সবাই যাচ্ছে আমি না গেলে কী এমন হবে'–
এই যুক্তি কি কোনো রাসূল প্রেমিকের সামনে টিকতে পারে? এতে কি তোমার রাসূলপ্রীতি ক্ষত-বিক্ষত হবে না?'

কিন্তু প্রবৃত্তি এসে এখানেও আবার যুক্তি পেশ করলো–
'এটা সত্যি। কিন্তু তুমি তো এর আগে জিহাদে জিহাদেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছো!
আজ যুদ্ধের গুরুভার থেকে একটু বিশ্রাম নিলে কী এমন অপরাধ হয়ে যাবে? শুধুমাত্র একবারের জন্যে?'

এই ঝড়ে তোলপাড় হচ্ছিলো আবু খায়সামার হৃদয়-জগত। শয়তানের যুক্তির পর যুক্তি এবং বিবেকের পাল্টা যুক্তির পর পাল্টা যুক্তিতে যখন চলছিলো এই মহা দ্বন্দ্ব, তখন হঠাৎ নেমে এলো তাঁর চোখে ঘুম। ঘুম ভাঙলে কী হবে? কী ভাববেন আবু খায়সামা? আগের মতোই না নতুন কিছু?

চার.

এখন সকাল। মদীনার অন্যদিনের সকালের চেয়ে এই সকালটা একটু ভিন্ন। আজ সবার মুখে তাবুক অভিযানের কথা। রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার কথা। মদীনার ঘরে-বাইরে, পথে-প্রান্তরে, সমতল কিংবা ঢালু ভূমিতে– যে যেখানে আছে, সবাই জানে আজকের অভিযানের কথা। একটু পরই রওয়ানা হবে জিহাদী কাফেলা। একটু পরই মরুভূমির বুক চিরে এগিয়ে যাবে ইসলামের বীর সন্তানরা। সবার হাতেই শোভা পাচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র। ঢাল-তলোয়ার ও বর্ম-বর্শা। তীর-তূণীর তো আছেই। মুখে জিহাদী চেতনায় প্লাবিত দ্যুতি। শাহাদত লাভের দীপ্তি। বিজয় লাভের সংকল্পময় আভা।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বচিত্রটা এখন এ রকম–

এক কিশোর বালক নবীজীর কাপড় জড়িয়ে ধরে আছে। ওর বায়না– 'আমি জিহাদে যাবোই। আমাকে নিতে হবেই।' ইসলামের জন্যে, ইসলামের নবীর জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার সোনালী ইচ্ছায় ঝলমল করছে ওর মায়াকাড়া অশ্রুসিক্ত মুখাবয়ব। নবীজী যখন অসম্মতি জানালেন ওকে জিহাদে নিতে ছোট্টো বলে, তখন ওর সে কি কান্না! সাথে সাথে নবীজী মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেন। ওর জন্যে বরকত ও কল্যাণের দু'আ করেন। অন্যদিকে একদল তরুণ 'জিহাদী মহড়া'য় মশগুল। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে তরবারী চালনার ঝনঝন শব্দ। কোথাও বা চলছে তিরন্দাযির নিখুঁত নিশানাবাযির প্রতিযোগিতা। অন্যত্র চলছে আসন্ন সফরের জন্যে উপযোগী ও কুশলী পথ কোনটি হবে– তা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা। অনতি দূরেই আবার চলছে শিশু-কিশোরদের দৌড়ঝাঁপ ও ছোটোছুটি। কেউবা আবার মনকাড়া আওয়াজে, সুর করা ঐকতানে, স্বভাব সুলভ সাবলীলতায় আবৃত্তি করছে– জিহাদী সঙ্গীত। নারীদের অবস্থানকে আড়াল-করা দেয়াল ও প্রাচীরকে যদি কারো দৃষ্টি ভেদ করতে পারতো, তাহলে তার চোখে ফুটে উঠতে বিস্ময়! আসন্ন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হেরেমের মা-বোনেরাও মহা ব্যস্ত। তাদের ভিতরেও চলছে– মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সশ্রূষাকে ঘিরে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ আলোচনা। মসজিদে নববী কি তখন ছিলো লোকশূন্য? না! সেখানেও কেউ ছিলেন নামাজরত। কেউ ছিলেন মুনাজাতরত। তাঁদের নামাজে ফুটে উঠেছে দাসত্ব

ও আত্মসমর্পণের বর্ণিলতা এবং তাঁদের আবেগঘন মুনাজাতের ভাষায়– অশ্রু ও মিনতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব এক স্বর্গীয় দ্যুতনা।

পাঁচ.

তিরিশ হাজারের বিশাল বাহিনী এখন এগিয়ে চলছে তাবুকের পথে। কিন্তু আবু খায়সামা এখনো জানেন না কী করবেন তিনি, তাবুকের ডাকে সাড়া দেবেন না মদীনাতেই পড়ে থাকবেন। হায়! এখনো প্রভাত হবে না কি তাঁর দুঃসহ মনোযাতনার অন্ধকার যামিনী? তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। দুঃখ ও বেদনায় এবং অভাব ও শূন্যতায় হৃদয় তাঁর ক্ষত-বিক্ষত। তার শূন্যতা ও দুঃখবোধ যেনো টপকে টপকে বেয়ে পড়ছে তাঁর নীরব অশ্রু-কাতর দৃষ্টি
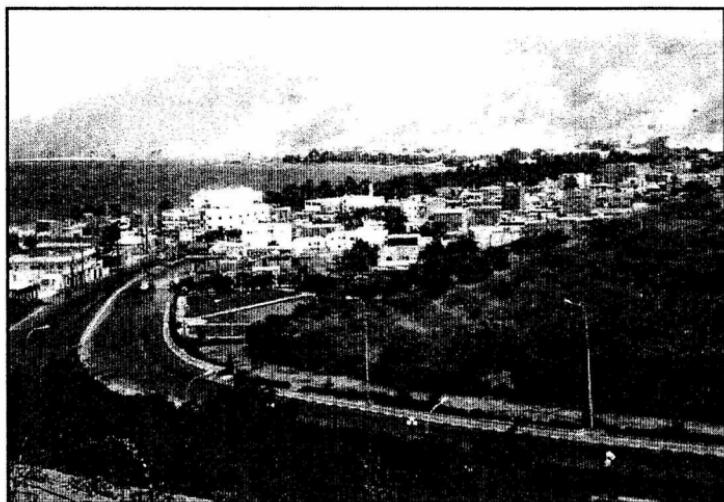
সমুদ্র ও পাহাড়ের কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান তাবুক শহর

থেকে। পাশে এসে বসলেন প্রথম স্ত্রী। কিন্তু পারলেন না তাঁর শূন্যতা ভরে দিতে কিংবা তাঁর মলিন মুখে দীপ্তি ছড়াতে। দ্বিতীয় স্ত্রীও এলেন। তিনিও ব্যর্থ হলেন। তাঁর ছায়াঢাকা উদ্যান এবং দৃষ্টিকাড়া খর্জুরবীথিও পারলো না তাঁর হৃদয় জগতে বয়ে যাওয়া এই মনোতাণ্ডব থামিয়ে সেখানে ছড়িয়ে দিতে প্রশান্তির হিমেল হাওয়া, প্রত্যয়ের দীপ্তিময় ঝলক! কেনো এমন হলো আবু

খায়সামার? আবু খায়সামা! তুমিও কি অবশেষে তাবুক যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা 'সেই তিন জন'-এর চতুর্থজন হবে!

ছয়.

'আবু খায়সামা! এ কী করলে তুমি? হায়! তুমি যদি পারতে তোমার জমানো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে মনের একটু শান্তি কিনে আনতে! যেমন কিনে আনো উট, দুম্বা ও বাণিজ্যিক পণ্য! কিন্তু পারবে না! শান্তি কখনো কিনতে পাওয়া যায় না! হৃদয়ে যখন বাসা বাঁধে দুঃখ-বেদনা, মনোজগতের কণ্ঠ যখন চেপে ধরে হতাশা ও উদ্বেগ, তখন জীবনটাই হয়ে উঠে এক সাক্ষাত জাহান্নাম। তোমার অবস্থাও কি তাই নয়– আবু খায়সামা? মৃত্যু ছাড়া এখন কোনো গতি নেই তোমার! মৃত্যু? না! মৃত্যুর কথা বাদ দাও। তুমি কি মৃত্যুভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো না? অথচ এই মৃত্যুই একদিন তোমাকে ভয় পেতো। তোমার ভয়ে পালিয়ে বেড়াতো। হঠাৎ কী হয়ে গেলো তোমার আবু খায়সামা! তোমার বন্ধুরা এখন তপ্ত মরুতে হাঁটছেন। আল্লাহ্‌র পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বীরদর্পে, অমিত সাহসে বুক বেঁধে, রোমক বাহিনীর বিষদাঁত ভেঙে দিতে।'

এ-সব ভাবতে ভাবতে আবু খায়সামার দু'চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। বলে উঠলেন– 'আমার আল্লাহ্! আমার মাওলা! তোমার রহমত ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই!!' আবু খায়সামা আবার কল্পনায় ফিরে আসেন। 'আবু খায়সামা! তোমার কতো বন্ধু, কতো সাথী এখন নবীজীর সান্নিধ্য পরশে ধন্য হয়ে পার হয়ে যাচ্ছে জিহাদের পথ। এরপরও কেমনে তুমি সুখ নিয়ে বাঁচতে চাও, প্রশান্তি নিয়ে থাকতে চাও? একা এখানে বসে? নবীহীন-বন্ধুহীন এই মদীনায় বসে?' আবু খায়সামা বড়ো বিপন্নবোধ করতে লাগলেন। এই বিপন্ন দশা থেকে মুক্তি কি মিলবে না তাঁর? কখন? 'রাত পোহাবার কতো দেরী ...?'

সাত.

সকালে গৃহে আর মন টিকলো না আবু খায়সামার। বেরিয়ে গেলেন মদীনার নিকটবর্তী একটা নির্জন পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের উঁচু টিলায় কিংবা নীরব

উপত্যকায় যদি একটু শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়! পাওয়া যাবে কি? আবু খায়সামা আপন মনে হাঁটতে থাকেন। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ। আবু খায়সামার বেদনাবোধ আরো বেড়ে যায়। হৃদয়তন্ত্রীতে হাহাকার করে উঠে বেদনার একটা করুণ সুর। কে হতে পারে? আমার মতো 'দলছুট' কেউ নয় তো ! তাবুকের দীর্ঘ সফরের ভয়াবহতা থেকে পালিয়ে আসে নি তো কেউ? আবু খায়সামা পেছনে তাকালেন। দেখলেন এগিয়ে আসছে এক ঘোড়সওয়ার। কাছে আসতেই দেখলেন ঘোড়সওয়ার তাঁর বাল্যবন্ধু। আগন্তুক দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে আবু খায়সামাকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু খেলেন। একটু পর দুই বন্ধুতে শুরু হলো বিভিন্ন কথা। আবু খায়সামা বন্ধুকে মোটেই বুঝতে দিলেন না মনের অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ কথার মাঝে বন্ধুটি বলে উঠলেন–

'আবু খায়সামা! মুহাম্মদের খবর শুনেছো?'

'মুসলিম বাহিনীর কী খবর জানো তুমি?'

'মুসলিম বাহিনী না বলে দুর্দশাগ্রস্ত বাহিনী বলা উচিত তোমার!'

'কিন্তু তাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত হবেন কেনো? সংখ্যায় তো তাঁরা তিরিশ হাজার!'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু দুশমনের মুখোমুখি হওয়ার আগেই তারা মুখোমুখি হয়েছেন ভয়াবহ সঙ্কটের।'

'আল্লাহ্‌র দোহাই! সব খুলে বলো আমায়!'

'তাঁদের রসদ শেষ। কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তীব্র পিপাসায় সমানে মারা যাচ্ছে জন্তু ও সওয়ারী। এখন না কি অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তিনজনকে মিলে একটি সওয়ারী ব্যবহার করতে হচ্ছে। আরো ভয়ঙ্কর খবর হলো, জন্তু-জানোয়ারের মল নিংড়ে নিংড়ে রস বের করে তা দিয়েই নিবারিত করতে হচ্ছে ভয়ংকর পিপাসা!'

আবু খায়সামা আবেগপ্লাবিত কণ্ঠে বললেন–

'মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্বাধীন সেই মহান জিহাদী কাফেলার জন্যে উৎসর্গীত হোক আমার প্রাণ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা এই কষ্ট ও দুর্দশার ভিতর দিয়ে জান্নাতের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন!'

আবু খায়সামা আর দাঁড়ালেন না। বন্ধুকে বিদায়ী সালাম দিয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে গৃহে ফিরে এলেন। তাবুকগামী বাহিনীর এই কষ্টের কথা শুনে বারবার তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিলো। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো সংকল্প ও প্রত্যয়ের একটা ছাপ।
আগের আবু খায়সামা কি বদলে যাবেন এখন?

আট.

কী শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ তাঁর গৃহে! ঢুকলেই প্রশান্তিতে ভরে যায় মনটা। কিন্তু এখন বড়ো অস্বস্তি লাগছে তাঁর। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন তিনি। স্ত্রীরা এগিয়ে এলেন ভালোবাসাভরা অভিবাদন নিয়ে, হাসিভরা মুখ নিয়ে, রকমারি খাবারের আয়োজন নিয়ে, সুপেয় পানির সোরাহি হাতে। কিন্তু আবু খায়সামা কোনো সাড়া দিলেন না। এখন কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করলো না। এমনকি তাঁর চোখ জোড়ানো, মন ভরানো, সৌরভ ছড়ানো উদ্যানও তাঁকে আকর্ষণ করলো না। এভাবে স্তব্ধ নীরবতায় কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তিনি বলে উঠলেন, বরং সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন- 'নিয়ে যাও 'এই সুস্বাদু' খাবার! আমি চাই না এই সুপেয় পানি! রাসূলের পাশে থাকলে, সাহাবীদের সাথে থাকলে কয়েকটা শুষ্ক খেজুরই এরচে' অনেক ভালো, অনেক উত্তম!'

না আবু খায়সামা! শুধু তাই নয়; মরুর বুকে ছুটে চলা সেই জান্নাতি কাফেলার সাথে থেকে পশুমল নিংড়ানো সেই 'রস-পান'ও এখন তোমার কাছে অমৃত মনে হবে! নয় কি? বরং তা-ই আজ তোমার কাছে মনে হবে বেহেশতের শারাবান তহুরা! নবীজী পাশে থাকলে, বন্ধুরা সাথে থাকলে তোমার জন্যে আজ বিষ হয়ে যাবে মধু, কাঁটা হয়ে যাবে ফুল, মরু হয়ে যাবে উচ্ছল ঝরনা!

আবু খায়সামা একটু পর আবার চীৎকার করে উঠলেন- 'জলদি নিয়ে এসো আমার ঢাল-তলোয়ার! এক্ষুণি হাজির করো আমার তীর-তূণীর! এই মুহূর্তে বের করো আমার আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটা! আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলের সাথে দেখা হওয়ার আগে তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না!'

নয়.

দক্ষিণমুখো ছুটে চললো আবু খায়সামার ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে। ঘোড়া তাঁর 'ঘোড়া' হয়েও পেলো যেনো বোরাকের গতি! মুহূর্তেই পেছনে হারিয়ে যাচ্ছে কতো পাহাড়-টিলা, কতো মরু-বিয়াবান। চারদিকের নীরব প্রকৃতি যেনো হঠাৎ সরব হয়ে ধ্বনি তুললো– 'মারহাবা! মারহাবা! হে তাবুকগামী আবু খায়সামা!!' আবু খায়সামার মনোজগতে নেই এখন কষ্ট। আছে শুধু আঁধার থেকে আলোতে আসার দ্যুতি ছড়ানো সোনালী রূপালী আনন্দ-ঝিলিক। আছে শুধু রাসূলকে কাছে পাওয়ার উদগ্র বাসনা।

এই আনন্দানুভূতি আগে কি কখনো পরশ বুলিয়েছিলো তাঁর মনে? না!

মরুর বুকে ঝরনাধারা এমন করে আগে কি কখনো প্রবাহিত হয়েছিলো? না, হয় নি!

তাঁর চোখের সামনে জান্নাতের নান্দনিক ছবি আগে কি এমন করে ভেসে উঠেছিলো? না, উঠে নি!

আগে কি কখনো তাঁর হৃদয় জগতে বয়ে গিয়েছিলো অনাবিল আনন্দের এমন ছলোছলো স্রোতধারা? যায় নি!

আহা! কোত্থেকে কোথায় চলে এলেন তিনি! এখন কেটে গেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সব আঁধার! এখন সামনে শুধু ঈমানী চেতনায় শাণিত জিহাদী জযবার আলো! এখন শুধু জান্নাতের দিকে নিরন্তর ছুটে চলা!

'আবু খায়সামা! আঁধার থেকে আলোতে ছুটে আসতে কেনো তোমার এতো দেরী হলো? আসলে এ ছিলো শয়তানের কারসাজি! শয়তান কি এভাবেই মানুষকে বিপথগামী করে .. তার ইন্দ্রজালের বাঁকে বাঁকে, প্রতারণার পাঁকে পাঁকে?!'

আলহামদু লিল্লাহ! সবই এখন অতীত। এখন একটু পরই তাঁর দেখা হবে শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে। জিহাদের নবীর সাথে। রহমাতুল-লিল্-আলামীনের সাথে। তাঁর বন্ধুদের সাথে। আবু খায়সামা এগিয়েই চলছেন। সামনে আসছে কখনো বিশাল মরু-বিয়াবান, কখনো উপত্যকা, কখনো ঢালুভূমি, কখনো আগুনঝরা সূর্য, কখনো রাতের নিকষ কালো আঁধার। কিন্তু গতি তাঁর শ্লথ হয় নি। সফর তাঁর বিলম্বিত হয় নি। শরীর তাঁর ন্যুব্জ হয় নি। মন তাঁর দুর্বল হয়

নি। রাতের পরে দিন এসেছে। দিনের পরে রাত এসেছে। কিন্তু তাঁর চলার গতি ছিলো অবিরাম, ক্লান্তিহীন। কোথাও থামেন নি তিনি। মুহূর্তের জন্যে ঢলে পড়েন নি নিদ্রার কোলে। এভাবে ছুটতে ছুটতেই একদিন পৌঁছে গেলেন তিনি মনের ঠিকানায়। স্বস্তির আঙিনায়। হঠাৎ ভেসে উঠলো তাঁর দৃষ্টিসীমায়– সারি সারি তাঁবু! আনসার-মুহাজিরদের পতাকা! কাছাকাছি হতেই কানে এলো মধুর গুঞ্জরন! কেউ মশগুল আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনে! কেউ আকুল বিনীত মুনাজাতে!

মূল বাহিনীর কাছে যাওয়ার আগেই আশ-পাশে ছড়ানো ছোটো ছোটো দলের সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। কী মজা! কী শান্তি! দেরীতে হলেও আবু খায়সামাকে নিজেদের মাঝে হাজির পেয়ে সবাই আনন্দিত। সবার সাথেই হলো হৃদ্যতা-উষ্ণতা-প্লাবিত আলিঙ্গন! সবার চোখের তারায় তখন যেনো রূপময় হয়ে উঠলো জান্নাতের কল্পরূপ!

দশ.

আল্লাহ্‌র নবী বিশ দিন পর্যন্ত তাবুক অবস্থান করলেন। কিন্তু এর মধ্যে রোমক বাহিনী একবারের জন্যেও সুরক্ষিত 'হিমস' নগরী থেকে বের হবার সাহস দেখালো না। এমন কি একটু উঁকি পর্যন্ত দিলো না। নবীজীও একেবারে 'ঘরে ঢুকে' হামলা করা ঠিক মনে করলেন না। তাই সোনালী বিজয় নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এদিকে বিজয়ের কথা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। প্রান্তে প্রান্তে। ধূলিস্মাত হয়ে গেলো মুনাফিকদের সব অশুভ পরিকল্পনা। রাগে-ক্ষোভে-হতাশায়-আশঙ্কায় তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে লাগলো। চোখের সামনে নেমে এলো অন্ধকার। স্তূপীকৃত অন্ধকার। ইসলামের বিজয় অভিযান ও জয়যাত্রার সামনে এখন ছোটো দুশমন, বড় দুশমন সবাই কম্পমান। পরাশক্তি রোম সম্রাট যদি না পারেন ইসলামের 'বিজয়রথ' থামাতে .. তাহলে কে আর পারবে?

আবু খায়সামা তাঁর প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে অন্য সবার সাথে ফিরে চললেন

মদীনায়। শান্তি, সৌভাগ্য আর আনন্দ উপচে পড়ছিলো যেনো তাঁর মুখাবয়ব থেকে। সবার আগে নবীজী, তারপর সাহাবীরা। ধীরে ধীরে কমে আসছে মদীনার দূরত্ব। সবার মুখে আল্লাহ্‌র যিকির। সবার ঠোঁট আন্দোলিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্তুতি বন্দনায়, তাঁর কৃতজ্ঞতা বর্ণনায়। এ-ই মুসলমানদের 'বিজয় মিছিল'! কী সুন্দর এ মিছিল !

মদীনার কাছাকাছি যখন পৌঁছলো কাফেলা, আবু খায়সামার চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাঁর সুন্দর বাড়িটি! আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর! তাঁর উদ্যান ও খর্জুরবীথিটা যেনো জান্নাতের একটা সবুজ টুকরো! আগের চেয়ে আরো সুন্দর, আগের চেয়ে আরো অপরূপ রূপময় মনে হচ্ছে তার সবুজাভ দৃশ্যাবলীকে! কিন্তু এ-সব ভাবার এখন সময় কোথায়? হৃদয় এখন তাঁর আলোড়িত হচ্ছে 'না যেতে যেতেও' মহান তাবুক অভিযানে শরীক হতে পারার সীমাহীন আনন্দে আর কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভে আল্লাহ্‌র মহিমায়, তাঁর কৃতজ্ঞতায়, তাঁর অযূত-নিযূত স্তুতিগানে!

মদীনার নিকটবর্তী হতেই আনন্দোচ্ছল শিশু-কিশোররা ছুটে এলো কলরোল ও হর্ষধ্বনির নিশান উড়িয়ে। দলে দলে। জিহাদ থেকে বাবাকে, ভাইকে, সর্বোপরি প্রিয় নবীজীকে ফিরে আসতে দেখে তাদের হৃদয়ে বয়ে গেলো আনন্দের জোয়ার। চোখে মুখে দীপ্তি ছড়াচ্ছিলো প্রভাত-কিরণের স্নিগ্ধ লালিমা। কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে উঠলো আবার সেই স্বাগত সঙ্গীত ....
তালা'আল বাদরু আলাইনা......
ঐ তো আমাদেরে আলো দিতে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ! সানিয়্যাতুল ওয়াদা উপত্যকার মুখে!..........

লেখক- নজীব কিলানী
মিশর

নবুয়ত উদ্যানের
সব ফুলই এমন সুরভিত

এক.

ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ তন্ময়চিত্তে তাকিয়েছিলেন তাঁবুর বাইরে। মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছিলেন দামেস্কের প্রকৃতির নৈঃস্বর্গিক দৃশ্য। দামেস্ক! সত্যিই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অপূর্ব লীলাভূমি! প্রকৃতির নান্দনিক দৃশ্যরা এখানে অবিরত দোল খায় স্বর্গীয় মহিমায়। দৃষ্টি কাড়ে পথিকের, দৃষ্টি কাড়ে প্রকৃতি-প্রেমী মানুষের। এ-যেনো দুনিয়ায় বসে সেই জান্নাত দেখা, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাঁর পুণ্যবান বান্দাদেরকে।

ফাতেমার উঠতে মন চাইছিলো না। কিন্তু উনানের কাছে যেতে হবে এক্ষুণি। উনানের কাছে যেতে যেতে ফাতেমা একটা আরবী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন গুনগুনিয়ে। রোমানদের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বীরত্বগাথা নিয়ে রচিত এই কবিতা।

হঠাৎ কানে এলো তাঁবুর বাইরে কার যেনো পদধ্বনি। ঘুরে তাকালেন ফাতেমা দরোজার দিকে। কিন্তু কে এসেছে... তা দেখার আগেই শোনা গেলো তার এক প্রিয় বান্ধবীর আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠ–

'এই ফাতেমা! সু-সংবাদ!' বলে বান্ধবী প্রবেশ করলো তাঁবুতে। তার মুখে লেগে আছে এক টুকরো হাসি– খেজুর বাগানের মাথার উপর এক ফালি চাঁদের মতো। ফাতেমা উৎসাহভরা চোখে তাকালেন বান্ধবীর দিকে। বললেন–

'কী সু-সংবাদ বোন!'

'যুদ্ধ ছাড়া আর কী শোনাবো আমি!'

ফাতেমা বান্ধবীর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন। চোখে-মুখে সৌভাগ্য ও আনন্দের দীপ্তি ছড়িয়ে বললেন–

'আমি জানি তুমি কী বলবে!'

'জানলেও সবটুকু জানো না। আমাদের ফওজ যে ইতিমধ্যে দামেস্কের প্রাচীর অতিক্রম করে শান্তি ও সম্প্রীতির পয়গাম ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে এবং এই আলোর কাফেলাকে দামেস্কবাসী যে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে– সে খবর জানো?'

ফাতেমার চোখ-মুখ আবার ঝিলমিল করে উঠলো দ্বিগুণ আনন্দে, দ্বিগুণ উৎসাহে। বললেন–

'সত্যি বলছো তো!'

'একদম সত্যি। সুর্যের প্রখর রৌদ্র ছড়ানোর মতো সত্যি! চাঁদের রূপালী জোছনা ছড়ানোর মতো সত্যি! তারকাপুঞ্জের স্বপ্নীল দীপ্তি ছড়ানোর মতো সত্যি! একটু পরই তুমি শুনতে পাবে বিজয় মিছিলের আনন্দঘন কোলাহল ও দামামা। তখন মুখর হয়ে উঠবে দামেস্কের আকাশ-বাতাস ও জান্নাততুল্য এই প্রকৃতি।'

সখীর কথা শুনতে শুনতে ফাতেমা স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে গেলেন তার আরো ঘনিষ্ঠ স্পর্শে। তাকে আলিঙ্গন করলেন। কপালে চুমু খেলেন। তারপর আবেগ-প্লাবিত কণ্ঠে বললেন–

'বোন আমার! সত্যি এ এক বড় সু-সংবাদ। কতোদিন ধরে আমরা দামেস্ক নগরী অবরোধ করে রেখেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলো না। অথচ একটু আগেও আমি ভাবছিলাম যে রোমানরা হয়ত বা আত্মসমর্পণ করবে না এবং আমাদের হাতে সহজে নগরীর চাবি তুলে দেবে না।'

'কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছিলো জানো? আমার মনে হচ্ছিলো রোমানরা আত্মসমর্পণ করবেই। কারণ ওরা তো জালিম-অত্যাচারী। ওদের হাতে লেগে আছে হাজার হাজার মাজলুমের রক্ত। ওরা সাম্রাজ্যবাদী। উড়ে এসে জুড়ে বসা এক অভিশপ্ত জাতি। কী করে ওরা লড়াই করে বিজয় লাভ করতে পারে এমন এক কওমের মুকাবিলায়, যারা দ্বীনের স্বার্থে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে শহিদী মওতকে। তাই আত্মসমর্পণ ও পরাজয়ই যে ছিলো

ওদের ‘শেষ পরিণতি’- এ ব্যাপারে আমি ছিলাম নিঃসন্দেহ।’
ফাতেমা বান্ধবীর কথায় সায় দিয়ে বললেন—
‘হ্যাঁ বোন! রোমানরা সত্যি লড়াই করে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর অপসৃয়মান যশ-খ্যাতির জন্যে আর আমরা রক্ত ঝরাই হাসিমুখে ইসলামের জয়যাত্রাকে বাঁধামুক্ত ও শত্রুমুক্ত করার মহান লক্ষ্য নিয়ে।’
এ কথা শুনে ফাতেমার বান্ধবী বড়ো মিষ্টি করে হাসলো এবং বললো—
‘ফাতেমা! তুমি কি জানো, ‘বিজয়ের নায়ক’ কে? তিনি তোমার প্রিয় ভাই সিপাহসালার হযরত খালিদ! তাঁর শানে এখন মুখে মুখে আবৃত্ত হচ্ছে কতো স্তুতিগাথা আর প্রশস্তিমালা! সত্যি তিনি আল্লাহ্‌র তরবারী! ‘ফেতনায়ে ইরতিদাদ’ (নবীজীর মৃত্যু পরবর্তীকালীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের দমন করা)-এর মহান বীর! ইরাক বিজয়ের মহান বীর!’
এরপর বান্ধবী আরো আবেগপ্লাবিত হয়ে বললেন—
‘হে ওয়ালিদ পরিবার! সত্যি তোমরা আমাদের গর্ব। মহান সেনাপতি খালিদ তোমাদের জন্যে বরং গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে নির্মাণ করে যাচ্ছেন সম্মান, মর্যাদা ও গর্বের এমন মিনারচূড়া, পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও যে চূড়া দাঁড়িয়ে থাকবে স্বমহিমায়, স্বগৌরবে!’

বিনয়-নম্র কণ্ঠে ফাতেমা বললেন—
‘প্রিয় বোন আমার! ব্যক্তি ও পরিবার হিসাবে আমাদের আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। সেনাপতি খালিদেরও আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই। আমরা তো লড়াই করি আল্লাহ্‌র বলে বলীয়ান হয়ে। তাঁর শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে। আমরা লড়াই করি সেই দ্বীনের খাতিরে, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে যা আমাদেরকে দেখিয়েছে আলোর পথ। শুনিয়েছে চিরকালীন জীবনের মহামুক্তির মহাপ্রাপ্তির মহা পয়গাম। আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে জিহাদের ঝাণ্ডা। যা নিয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি দেশ থেকে দেশে, মহাদেশ থেকে মহাদেশে। বিজিত ভূ-খন্ডে ছড়িয়ে দিয়েছি ইসলামের জ্যোতি। হকের রৌশনী। সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছি মানবতার পয়গাম।’

❂ ❂ ❂

ফাতেমার কথা শেষ না হতেই কানে ভেসে এলো বিজয়-দামামা। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো চারদিক। মুখরিত হলো ফাতেমা আর তার বান্ধবীর হৃদয়-জগতও। তারা ছুটে এলেন তাঁবুর বাইরে। বিজয় মিছিল লক্ষ্য করে ছুটে গেলো আনন্দোদ্বেল শিশু-কিশোরদের ছোট ছোট 'ঝাক'। এখানে ওখানে সর্বত্র কেবল একই কথা– রোমানরা আত্মসমর্পণ করেছে। মুসলিম ফওজ বিজয়বেশে ঐ যে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউবা অদূরে দাঁড়িয়ে গাইছিলেন বিজয়ের গান। কেউবা আবার আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে আকাশের নিঃসীম শূন্যতায় ছুঁড়ে মারছিলেন তীর। কেউবা আবার দাঁড়িয়ে গেলেন 'সালাতুশ শোকর' আদায় করতে। কেউবা আবার মেতে উঠলেন আগামী অভিযানের সম্ভাব্য লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আলোচনায়। লক্ষ্য সবার একটি-ই। ইসলামের সবুজ মানচিত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে। দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে ইসলামের পয়গাম।

বিজয় লাভের এই আনন্দঘন দৃশ্য দেখে দুই বান্ধবী বারবার হাসিঝলমল চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন। ফাতেমা বললেন–

'কে পৌঁছে দেবে খলীফাতুল মুসলিমীনকে এই বিজয়বার্তা? হায়! আমার দু'টি ডানা থাকলে আমি এই মুহূর্তে উড়ে যেতাম মহান খলীফা হযরত আবু বকরের কাছে!'

'তাই বুঝি! এতো ব্যস্ত হয়ো না বোন! শিগ্রই খলীফার কাছে বার্তাবাহক রওয়ানা হবে। যেতে যেতে সে ছড়িয়ে দেবে বিজয়বার্তা– সবখানে, সবার কাছে।'

ফাতেমা মুচকি হাসির আলো ছড়িয়ে বললেন–

'আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে ...... !'

'কী? মদীনায় উড়ে যেতে?'

'হ্যাঁ রে বোন! আজ কতোদিন দেখি না মদীনাকে। দামেস্কের সবুজ-শ্যামলিমা আর নজরকাড়া প্রকৃতির ভিতরে বসেও আমি এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি নি আমার মাতৃভূমি মদীনাকে। মাতৃভূমি সব সময় মহান। মাতৃভূমির সাথে জড়িয়ে থাকে কতো স্বপ্ন, কতো স্মৃতি! তা ছাড়া এই মদীনা

তো শুধু আমার মাতৃভূমিই না, এ যে আমার প্রিয় নবীর প্রিয় ঠিকানা!! অবশ্য এই প্রবাসের বিরুদ্ধেও আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারণ আমরা এখানে দামেস্কের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে আসি নি। আমরা এসেছি শুধু আল্লাহ্র হুকুমে। তাঁর বাণীকে দেশে দেশে , সমাজে সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।'

দুই.

মুসলিম ফওজের ধারাবাহিক বিজয় অভিযান দুশমনের মনে যে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বিজয়ের প্রাণপুরুষ হিসেবে যার নাম উচ্চারিত হচ্ছে সবার মুখে মুখে, তিনি বীর সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। শত্রু শিবিরে ত্রাস ও আতংক ছড়ানোর জন্যে তাঁর নামটিই ছিলো যথেষ্ট। দুশমনের মনে এ-কথা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, সেনাপতি খালিদ যে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন সে যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুসলিম ফওজের ভিতরেও এ-ধারণা কম-বেশি গেড়ে বসেছিলো যে, জিহাদের ময়দানে হযরত খালেদই আমাদের প্রেরণা। অন্যতম ভরসা। সেনাপতিত্বের পতাকা বহন করার জন্যে তিনিই সবার সেরা। মুসলিম জাহানের জন্যে খলীফা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জিহাদের ময়দানে আমাদের জন্যে হযরত খালিদও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো যে কেউ কেউ 'আল্লাহই বিজয়ের একমাত্র উৎস' এ-কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তি-ক্ষমতা ও ব্যক্তি-মাহাত্ম্য-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ছিলেন– নিজের অজান্তে।

এদিকে হযরত খালিদও এগিয়ে যাচ্ছিলেন জিহাদী-স্পৃহা নিয়ে রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে। তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের মনের এই ভয়ংকর অবস্থা বিশ্লেষণ করার কোনো ফুরসতই তাঁর মিলছিলো না। নতুন নতুন যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিয়ে এবং বিজিত এলাকায় সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার সু-ব্যবস্থাপনায় তিনি কাটাচ্ছিলেন ভীষণ ব্যস্ত সময়।

হঠাৎ স্তিমিত হয়ে এলো বিজয়োৎসবের উল্লাস। থেমে গেলো নাকারার আওয়াজ ও বিজয়-ব্যঞ্জক কবিতা-সঙ্গীত। একটু আগে যে শিশু-কিশোররা উচ্ছলিত ছুটোছুটিতে মেতে ছিলো, তাদের মুখেও নেমে এলো একটা বিষাদের ছায়া।
সবাই জায়গায় জায়গায় জটলা করে দাঁড়িয়েছিলো।
চেহারায় সবার শোকের ছাপ, বেদনার দাগ।
দৃষ্টিতে সবার পিতৃহারা এতিমের অসহায় করুণ চাহনি।
কী ঘটেছে?!
রণক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো বিপর্যয়?
কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি একটি সুনিশ্চিত বিজয় কীভাবে পরাজয়ে বদলে যাবে...?
দামেস্ক নগরীর খুলে দেওয়া প্রবেশদ্বার দিয়ে ঐ তো ... এখনো প্রবেশ করছে ইসলামী লশকরের বিজয়ী সদস্যরা!
না কি কোনো মুসলিম বীর শাহাদতের পেয়ালা পান করে চলে গেছেন অবিনশ্বর জগতে ... যার শোক ছেয়ে গেছে সবার অনুভবে-মুখাবয়বে?
ফাতেমার হৃদয় ধুকধুক করছিলো শত অজানা আশংকায় আর অস্থিরতায়। পাশে তার বান্ধবীও নিথর দাঁড়িয়েছিলো একটু আগের দীপ্তি ছড়ানো মুখটায় আশংকা ও অস্থিরতার আঁধার নিয়ে। ফাতেমা কম্পিত স্বরে বললেন–
'বোন! কী হয়েছে কিছুই যে বুঝতে পারছি না!'
'আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমার মন বলছে বড় ধরনের কোনো দুঃসংবাদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ফাতেমা ভাবলেন এক্ষুণি বান্ধবীকে পাঠিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটা জেনে নেবেন .. ঠিক তখনই সেনাপতি খালিদকে তাঁবুর দিকে আসতে দেখা গেলো। ফাতেমা দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলেন আর বান্ধবীটি চলে গেলেন পর্দার আড়ালে। হযরত খালিদকে সুস্থাবস্থায় আসতে দেখে ফাতেমা খুশি হলেন। তাকে সদ্য বিজয়ের জন্যে মোবারকবাদও জানালেন। কিন্তু পরিস্থিতি তখন মোবারকবাদ জানানোর অনুমতি দিচ্ছিলো না। তাই কণ্ঠ তার বারবার আটকে আসছিলো। বিজয়ের শোভাযাত্রায় ছেয়ে যাওয়া 'হঠাৎ বিমর্ষতা' আর

এইমাত্র পড়া ভাইয়ের মুখাবয়বের ভাষা ছিলো অভিন্ন।
হযরত খালিদ ছিলেন নিশ্চুপ, শোক-মলিন। ফাতেমার কথার কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না। এক পাশে তলোয়ারটা রাখতে রাখতে তাকালেন অশ্রুপূর্ণ চোখে বোনের দিকে। তখন টপটপ ঝরে পড়লো ক'ফোটা অশ্রু। কাঁপা কাঁপা আওয়াজে বললেন–
'একটু পানি দাও।'
ফাতেমা পানি দিতে দিতে বললেন–
'কী হয়েছে ভাইজান?! জলদি বলুন তো! চারদিকে কেনো এই বিমর্ষতা? কেনো আপনার চোখে পানি? কী হয়েছে?!'
হযরত খালিদ পাত্রটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন–
'একটু আগে মদীনা থেকে দূত এসেছে! খলীফাতুল মুসলিমীন আর নেই!!'
ফাতেমার সামনে যেনো গোটা জগৎ সংসারটা দোলে উঠলো! তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন–
'কী! খলীফা নেই?! ... ইন্না লিলাহি ....!
হযরত খালিদ কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন–
'খলীফা এমন সময়ে চলে গেলেন, যখন তাঁকে আমাদের সবচে' বেশি প্রয়োজন ছিলো! রোম-পারস্যে এখনো আমরা অভিযান শুরু করতে পারি নি!'
ফাতেমা চোখের আঁসু মোছতে মোছতে বললেন–
'হযরত আবু বকরের প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক। তিনি অনেক বড় বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। ইরতিদাদের ফিৎনা দমন করে গেছেন। ভণ্ড নবীদের উৎখাত করে গেছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী লশকরকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।
জান্নাতই হোক তাঁর ঠিকানা!'
ফাতেমার দু'চোখ থেকে টপটপ বেয়ে পড়ছিলো অশ্রুর ফোঁটা। নীরব এই অশ্রুধারার ভিতরেও ফাতেমা আল্লাহ্‌র ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।
কী আর হবে এখন অশ্রু ঝরিয়ে?
বিলাপ করে? ..

কুদরতের ফায়সালা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বাহ্যিকভাবে যদিও এখন খলীফার ভীষণ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো, কিন্তু আল্লাহ্‌র তাকদীর তো আর খণ্ডন করা যায় না!
আল্লাহ্‌র তাকদীর অখণ্ডনীয়!

তিন.
ফাতেমা ভাবতে লাগলেন পরবর্তী খলীফা কে হবেন তা নিয়ে।
ফাতেমা নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন–
কে হতে পারেন পরবর্তী খলীফা?
কেমন হবেন তিনি?
পারবেন কি এই নাযুক মুহূর্তে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে, হযরত আবু বকরের মতো বীরত্বের সাথে, নিষ্ঠার সাথে?
পারবেন কি ইসলামের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে?
ফাতেমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো ভাই খালিদের কাছে পরবর্তী খলীফার ব্যাপারে এইসব জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু বর্তমান শোকাবহ পরিস্থিতিতে এ প্রসঙ্গটা ওঠানো তিনি ঠিক মনে করলেন না।
এই সময়ে কি কেউ এমন ধরনের প্রশ্ন করতে পারে?
এ-সব ভাবতে ভাবতেই ফাতেমা উঠতে যাচ্ছিলেন .. তখনই হযরত খালিদ বললেন:
'আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা হিসাবে উমরের নাম অসিয়ত করে গিয়েছেন।'
'উমর!'
'হ্যাঁ!'
'কিন্তু!'
'কিন্তু কী ফাতেমা?'
'না! ভাবছিলাম তাঁর কঠোরতার কথা।'
'শাসন করতে গেলে কি কঠোরতা লাগে না?'
'তা ছাড়া আপনার ব্যাপারেও বেশ কিছুদিন থেকে উমরের মন প্রসন্ন ছিলো না!'

খালিদ তখন একটু তিরস্কারের স্বরে বোনকে বললেন–
'ফাতেমা! তোমার ভুলে যাওয়া উচিত না আল্লাহ্‌র রাসূল উমর সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি বলেছেন– 'সত্যকে উমরের কণ্ঠে ন্যস্ত করা হয়েছে।' তা ছাড়া মানুষকে সত্যের পথে সু-গঠিত করতে গেলে তো কিছুটা কঠোরতা লাগেই! শুধু কি আবেগের কাছে, শুধু কি কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে?'

ফাতেমা নিরুত্তর রইলেন। কেননা তার আগের ভাই আর বর্তমান ভাই-এর মাঝে যে বিশাল ব্যবধান!
এখন তিনি সাইফুল্লাহ! আল্লাহ্‌র তরবারী!!
এখন তিনি ইসলামী লশকরের নন্দিত সেনাপতি।
নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনিই ভালো বুঝবেন। তেমনি এক সৈনিক হিসেবেও আনুগত্যের ধারা-উপধারা সম্পর্কে তিনিই ভালো বুঝবেন। তিনি যে নতুন খলীফা উমরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও আনুগত্যই পোষণ করবেন– এটাই স্বাভাবিক। কেননা যে উদ্দেশ্য সব সময় তাঁদের সামনে আলো ছড়ায়, ব্যক্তিগত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কখনই তাকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলতে পারবে না। পারবে না তাঁদের মাঝে বৈরিতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে।

চার.

সত্যি কথা বলতে কি, মহান খলীফা হযরত আবু বকরের ওফাতের খবরের পরও যে ভাবনা, যে চিন্তা বারবার হযরত খালিদকে তাড়িত করছিলো তা হলো ইসলামী বিজয় অভিযানকে কী করে আরো সামনে বাড়ানো যায় এবং কী করে সিরিয়া থেকে এবং আশ-পাশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে দুশমনকে হটিয়ে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

হযরত খালিদ এই খবর জানতেন না যে মদীনা থেকে দূত একটি নয়, দু'টি চিঠি নিয়ে এসেছে। একটি চিঠিতে খলীফার ওফাতের সংবাদ রয়েছে আর অন্যটিতে তাঁকে পদচ্যুত করে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে সেনাপতি নিয়োগের নির্দেশনামা রয়েছে।

অন্য কেউও জানতেন না এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠির কথা। বরং সদ্য সিরিয়া বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এবং এই বিজয়কে সু-সংহতকরণের মুহূর্তে এমন চিঠিও যে নতুন খলীফার কাছ থেকে আসতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। আরো আশ্চর্যের খবর হলো এই যে, এই চিঠির মারফত নিযুক্ত নতুন সেনাপতি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এই সংবাদ একেবারেই গোপন রাখলেন বীর সেনাপতি হযরত খালিদের কাছে। কিছুই তাকে জানতে দিলেন না। না হাব-ভাবে, না ইশারা-ইঙ্গিতে। তখন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ছিলেন অগ্রগামী বাহিনীর নিশান বরদার।

পাঁচ.

এরপর সময় পেরিয়ে গেলো বেশ কিছুদিন। ততোদিনে সিরিয়া পুরোপুরি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। অপরদিকে মদীনায়ও হযরত উমরের নতুন খেলাফত বেশ মজবুত হয়েছে। তখন একদিন আবু উবায়দা এলেন হযরত খালিদের কাছে সেই চিঠির বার্তা নিয়ে।

আবু উবায়দা ছিলেন ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত।

একদিকে কর্তব্যের খাতিরে অবিলম্বে নতুন খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা অপরদিকে সেনাপতি খালিদের প্রতি তার ভালোবাসা, তাঁর বীরত্বের প্রতি সীমাহীন সম্মান। এই অবস্থায় কী করে তিনি চিঠির এই ভয়ানক বাস্তবতা মুখে উচ্চারণ করবেন– 'খালিদ! খলীফা তোমাকে বরখাস্ত করেছেন সেই মুহূর্তে, যখন তুমি সম্মানের শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করছিলে!'

দ্বিতীয়ত তার পরের কঠিন সত্যটি-ই বা কীভাবে তিনি মুখে উচ্চারণ করবেন? কীভাবে তিনি বলবেন– '.. এবং স্থলাভিষিক্ত করেছেন আমাকে!!' কীভাবে বলবেন?!

কী করে তিনি এমন কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করবেন?

এ যে রোমকদের ভিতরে ঢুকে পড়ে তলোয়ার চালানোর চেয়েও কঠিন?!

শেষ পর্যন্ত আবু উবায়দা অনুচ্চ কণ্ঠে খালিদকে জানালেন চিঠির বক্তব্য! অপরদিকে খালিদও বিনা বাক্য-ব্যয়ে, বিনা প্রতিবাদে অত্যন্ত শান্তভাবে মেনে নিলেন খলীফার নির্দেশ। এমনভাবে এবং এমন ভঙ্গিতে যেনো কিছুই

ঘটে নি। খালিদের প্রতি আবু উবায়দার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আরো শতগুণ বেড়ে গেলো।

মাকবারায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বাইরে থেকে

মাকবারায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) ভিতর থেকে
পাশে শুয়ে আছেন তাঁরই ছোট ভাই

এমন তো হবেই! হযরত খালিদ যখন সেনাপতি ছিলেন তখনও লড়াই

করতেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, সেনাপতিত্ব কিংবা ব্যক্তিগত কোনো যশ-খ্যাতির জন্যে নয়। সুতরাং সেই মহান উদ্দেশ্যে এখনও তিনি লড়াই করবেন। এখনও তিনি দুশমনের ভিতরে তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।
যুদ্ধ তো যুদ্ধই!
জিহাদ তো জিহাদই!
তা সেনাপতি হিসেবেই হোক কিংবা সৈনিক বেশেই হোক!
ইসলামের যে কালেমা তাঁদের সবাইকে একত্রিত করেছে, তা তো বদলে যায় নি!
ইসলামের মহান আদর্শকে দেশে দেশে, হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার যে মহান লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা বেরিয়েছেন, তা তো তাদের পথে এখনও আলো ছড়াচ্ছে!
তাহলে খালিদ এখন 'সেনাপতি' না 'সৈনিক' তাতে কী আসে যায়?!
অবশ্যই আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ শিরোধার্য। যে কোনো মুহূর্তে তাঁর যে কোনো সিদ্ধান্ত পালনীয়।
কিছুক্ষণ নীরব থেকে সদ্য বরখাস্ত হওয়া সেনাপতি সদ্য নিযুক্ত সেনাপতিকে বললেন–
'আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন!। এই চিঠির কথা সাথে সাথেই কেনো তুমি আমাকে জানালে না?!'
আবু উবায়দা জবাব দিলেন–
'যুদ্ধ চলছিলো তখন। তখন আমি তোমার গতি নষ্ট করতে চাই নি। আমি তো আর দুনিয়ার যশ-খ্যাতি চাই না। এ-সব তো আজ আছে কাল নেই। অপসৃয়মান। দুনিয়া-আখেরাতে আমরা ভাই ভাই। সব সময় একজন আরেকজনের পাশে থাকবো।'

ছয়.

সৈনিকদের মধ্যেও এবার খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। তারাও সবাই মেনে নিলেন। যদিও হযরত খালিদের জন্যে তাদের মন খুব পুড়ছিলো। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ। তার উপর কোনো কথা চলে না। কিন্তু কিছু

কিছু সৈনিক ব্যাপারটাকে এভাবে গ্রহণ করলো না। তারা ভাবলো যে আমীরুল মুমিনীন সেনাপতি খালিদের অবমূল্যায়ন করেছেন। তারা আরো এটা সেটা বলাবলি করতে লাগলো। হযরত খালিদকে বিদ্রোহের জন্যে উৎসাহিত করতে লাগলো। কিন্তু একটু আগে যে 'মহান' খালিদের পরিচয় আমরা পেলাম, এখানে এসেও আবার সেই মহত্বের ঝলক দেখলাম। তিনি সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

সাত.

পরদিন সকালের দৃশ্য। জিহাদের জন্যে প্রস্তুত মুসলিম ফওজ। হযরত আবু উবায়দা এখন নতুন সেনাপতি হিসাবে হযরত খালিদের স্থলাভিষিক্ত। আর হযরত খালিদ একজন সাধারণ সৈনিকের বেশে তলোয়ার নিয়ে হযরত আবু উবায়দার পেছনে পেছনে হাঁটছিলেন। তাঁর মনে নেই কোনো দ্বিধা ও কষ্ট। নেই কোনো জ্বলন ও খেদ। ফাতেমা ভাইয়ের দিকে তাকালেন মুগ্ধতা মেশানো চোখে, শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টিতে। তারপর তাকালেন হযরত আবু উবায়দার দিকে এবং বললেন অভিভূত কণ্ঠে–
'আল্লাহু আকবার! হে ইসলামের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা! যেখানেই যাও তোমরা, বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে! তোমরা যে আলোকিত মানুষ!!'

লেখক- নজীব কিলানী
মিশর

ইমাম আজম

এক.
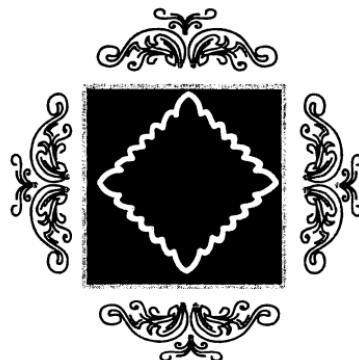
আগন্তুকের দৃষ্টি কী যেনো খুঁজছে। কুফার রাস্তায় চলতে চলতে সবকিছুর উপর সে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো। কখনো তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে পথচারিদের উপর। কখনো উঁচু কোনো ইমারতের উপর। কখনো অন্য কোথাও। তাকে দেখলেই মনে হয় তন্ময়চিত্ত ও গভীর অনুসন্ধিৎসু এক পাঠক যেনো একের পর এক উল্টে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিতাবের পাতা। কুফার চলমান জনতা অন্তত তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই ভাবছে। কারণ, এমন অনুসন্ধিৎসু ও গভীর দৃষ্টির মানুষ কুফা নগরীতে খুব দেখা যায় না।

কুফা নগরীর বড় মসজিদের সামনে এসে আগন্তুক ঘোড়াটাকে একটা নিরাপদ স্থানে বেঁধে ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে অগ্রসর হলো। সফরের ক্লান্তি ও অবসাদ যদিও ফুটে আছে তার চোখে মুখে এবং তার শুভ্র বসনে লেগে আছে ধূলিকণা, তবু তার চেহারায় ছিলো নূরের চমক। আলোকিত মানসের বিকশিত প্রভা।

সেকালে কুফা নগরী ছিলো ইরাকের মশহুর ও গুরুত্বপূর্ণ শহর।[১] সেখানে

১. যদিও এখন তা আমেরিকার হিংস্র শ্বাপদদের চারণভূমি। ইরাকের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটেরাদের অভয়ারণ্য। ভাবতে অবাক লাগে, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও সভ্য দেশ নাকি এই আমেরিকা! যুদ্ধবাজ লুটেরারা যখন উন্নত ও সভ্য হওয়ার দাবি করে, তখন বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না যে, মুসলমানরা ঘুমিয়ে আছে গাফলতের ঘুমে! সালাহুদ্দীন

তখন একদিকে যেমন ছিলো বিভিন্ন দর্শন ও ফালসাফা, অন্যদিকে ছিলো বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদ। একদিকে যেমন ছিলো শিয়া ও খারেজী, অন্যদিকে ছিলো আরব-আজমের আরো রকম-বেরকমের মানুষ। হ্যাঁ, ফিকাহ্ শাস্ত্র ও রাজনীতিরও ছিলো তখন সেখানে রমরমা অবস্থা। ছিলো নানান দেশের বণিক কাফেলারও নিত্য আনাগোনা। উমাইয়াদের শাসনকালের শেষ পর্ব চলছে তখন। হঠাৎ করেই নেমে এলো তাদের উপর আব্বাসীয়দের খড়গকৃপাণ।

কিছু দিনের মধ্যেই পতন হলো উমাইয়া শাসনের। এরপর আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় বসে বিরোধী পক্ষ ও বিদ্রোহী চক্র দমনে কঠিন কঠিন রক্তক্ষয়ী অভিযান পরিচালনা করছিলো। রাজ্যের স্থিতি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে যারাই ছিলো হুমকি, তারাই হলো তরবারীর বলি। এভাবেই লাশের স্তুপের উপর এবং রক্তের নদীর উপর নির্মিত হয়েছিলো আব্বাসীয়দের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

দুই.

কিন্তু থাক সে কথা।

এই আগন্তুক কে? .. আগন্তুক এসেছে মিশর থেকে। গর্বিত এক আরব সন্তান। আমর ইবনুল আস যখন মিশর বিজয় করেন, তখন থেকেই তার বাপ-দাদারা আবাস গেড়েছে এই মিশরের বুকে। কুফায় এসেছে সে বুকের ভিতরের একটি লালিত স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সোনালী ইচ্ছে নিয়ে। কুফার বড় মসজিদই তার গন্তব্য। কিন্তু মসজিদের প্রবেশদ্বারের কাছকাছি হতেই তার কানে এলো এক নারী কণ্ঠের চীৎকার, অট্টহাসি। এর উৎস ছিলো একেবারে মসজিদের সামনের বাড়িটাই। ঐ বাড়িতে এক আওরত সমানে চীৎকার ও চেঁচামেচি করছিলো। মনে হচ্ছে একেবারে বদ্ধ পাগলিনী। আলুথালু কেশ। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। বিধ্বস্ত চেহারা। বারান্দা ও

আইউবীদের জায়গা দখল করে নিয়েছে আবু আবদুল্লাহর মতো অবুঝ কাপুরুষরা কিংবা ক্ষমতালোভী মীর জাফররা! -ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী।

সামনের কামরার এ মাথা ও মাথা দৌড়াচ্ছে। কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। আবার কখনো ছাগলের আওয়াজ নকল করছে। পরক্ষণেই বিড়াল ও কুকুরের আওয়াজ। থামাতে গেলেই হাত-পা ছুঁড়ছে, আর দাপাদাপি করছে। পেছনে পেছনে আরেক মহিলা বারবার তাকে শান্ত করার কসরত চালিয়ে যাচ্ছে।

'উম্মে ইমরান! ছি! তুমি কি থামবে? কেনো এমন করছো? কেনো আমাদেরকে অপদস্থ করছো? দোহাই আল্লাহ্‌র, তোমার পাগলামো বন্ধ করো।'

না, উম্মে ইমরান থামলো না। বরং থামাতে গেলে আরো নতুন করে বেড়ে যেতো তার চীৎকার ও চেঁচামেচি। বেরুতে থাকতো একের পর এক কুকুর-বিড়াল-ছাগলের আওয়াজ। বড়ই বিশ্রী কাণ্ড। পাশাপাশি আবার ভেসে আসতো সেই উদ্বিগ্ন নারী কণ্ঠ–

'উম্মে ইমরান! মসজিদ লোকে লোকারণ্য! তাদের সামনে আমাদেরকে লজ্জিত করো না! এখানে বসে তালিম দেন, বিচার করেন কাজী আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা! কী বলবেন তিনি? এখানে বসেন ইমাম আজম আবু হানিফা! কী ভাববেন তিনি? দোহাই তোমার! ভিতরের কামরায় চলো! তুমি কি আমার মিনতি শুনবে না! ভিতরে যাবে না!'

মহিলা বড় আশা নিয়ে উম্মে ইমরানের হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু উম্মে ইমরান হেঁচকা টানে হাত ছুটিয়ে নিয়ে বলে–'দূর হ পাষাণী! আমাকে এখানে কেনো আটকে রাখতে চাস? আমি এই জেলখানায় থাকবো না।' এই বলে উম্মে ইমরান ছুটে বেরিয়ে যায় মসজিদের সদর দরোজার দিকে। সেখানে ছাগল ও কুকুরের চলন এবং বলন নকল করে হাঁটতে থাকে, চীৎকার করতে থাকে। অবস্থা যখন এই, তখন এক পথিক মজা করে জোরে হেসে উঠলো। এতে উম্মে ইমরানের পাগল মনেও আঘাত লাগলো। মুহূর্তেই আহত শার্দুলের মতো উম্মে ইমরান থমকে দাঁড়ালো এবং লোকটিকে লক্ষ্য করে বললো– 'এই হারামীর বাচ্চা!' এই কথা গিয়ে পৌঁছলো একেবারে কুফার শ্রেষ্ঠ কাজী, শীর্ষ আলেম ইবনে আবি লায়লার

কানে। তিনি তখন উম্মে ইমরানের পাশ দিয়েই মসজিদে ঢুকছিলেন। এ জঘন্য কথায় তাঁর চেহারা কালো হয়ে গেলো। তিনি মহিলাকে তার মজলিসে ধরে আনার হুকুম দিয়ে বললেন– 'এই মহিলা জঘন্যতম কথা বলেছে। মারাত্মক অপবাদসূচক কথা উচ্চারণ করেছে। এক্ষুণি তার বিচার হবে। তার অপরাধের সাজা হবে।'

একটু পরই উম্মে ইমরানকে তাঁর এজলাসে হাজির করা হলো। শুরু হলো বিচার কার্য। চিহ্নিত হলো অপরাধ। জঘন্য অপবাদ আরোপ করে রাস্তার মানুষ এবং মসজিদ ও মসজিদের ভিতরের মানুষের সম্মান নষ্ট করার অভিযোগে, ইসলামী সভ্যতা ও শিষ্টাচারের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জঘন্যতম কথা ও অশুভ আচরণের জন্যে উম্মে ইমরানের উপর 'হদ্দে কযফ' বা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করা হলো এবং তা কার্যকর করারও নির্দেশ জারি করা হলো। আর পথিকের বাবা এবং মাকে 'যিনাকার' ও যিনাকারিনী' বলার কারণে একসঙ্গে দুইবার 'হদ' (দ্বিগুণ শাস্তি) প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হলো।

মিশরের আগন্তুক এতোক্ষণ গভীরভাবে এ সব পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলো– অবাক-বিস্ময়ে। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশিক্ষণ সে ভাবলো না। তাকে ভাবতে হলো তার মিশর থেকে ছুটে আসার মূল কারণ নিয়ে। পাশের এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলো–

'ভাই! আমি কি তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! বলো কী জানতে চাও!'

'আমি মিশর থেকে এসেছি। ইমাম আজমের কাছে যেতে চাই।'

'ইমাম আজম! কোন্ ইমাম আজমের কথা বলছো?'

'মানে! এখানে কি ইমাম আজম দু'জন নাকি?'

'আরে ভাই! তুমি দেখি একদম নতুন। এখানে ইমাম আজমের কোনো অভাব নেই। অনেক ইমাম আজম। কেউ শিয়াদের ইমাম আজম। কেউ খারেজীদের ইমাম আজম। কেউ আহলে সুন্নাতের ইমাম আজম। আরো কতো ইমাম ...!' আগন্তুক এখানেই কুফী লোকটিকে থামিয়ে দিলো।

বললো–

'আমি এদের কারো কথা বলছি না। ইমাম আজম আবু হানিফার কথা বলছি। যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, ফিকাহবিদ, দীপ্তচিন্তার অধিকারী মহানুভব ইমাম আজম আবু হানিফার কথা জানতে চাচ্ছি। এই কুফায় থেকেও তুমি তাঁকে চিনতে পারছো না?!'

কুফী লোকটি আমতা আমতা করে বললো–

'ভাই! ঐ যে বড় হালকাটা দেখতে পাচ্ছো, সেখানেই বসেন ইমাম আজম আবু হানিফা। সেখানে তাঁর সামনে গোল হয়ে বসে আছে ছাত্ররা। সেখানে আছে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও হাসান এবং আরো অনেকেই। আর আমি আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লার ছাত্র।'

'ধন্যবাদ তোমাকে!'

'ধন্যবাদ আল্লাহকে!'

তিন.

আগন্তুক ইমাম আজমের হালকার দিকে যেতে লাগলো। ছাত্র বেষ্টিত ইমাম আজম বসে আছেন চারজানু হয়ে। ইমাম আজমের উপর চোখ পড়তেই আগন্তুকের আবেগ উথলে উঠলো। সৌভাগ্যময়তা ও আনন্দানুভূতিতে তার মন-মানসে আবেগের ঝড় উঠলো। একটা মহাপ্রাপ্তির অনুভূতিতে ভিতরটা একেবারে ভরে গেলো। এই আনন্দোদ্বেল আবেগের ভাষারা প্রতিচ্ছবিত হলো তার চোখে মুখে। তৃপ্তিভরা মৃদু হাসির ঝিলিক আলো ছড়াচ্ছিলো তখন তার ওষ্ঠযুগলে। সত্যি কি তার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে! ইমাম আজমের সাথে সাক্ষাতের স্বপ্ন! তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে বসে ইলম হাসিলের স্বপ্ন! সত্যি কি সে এখন পারবে তাঁর মজলিসে বসে তাঁর আলোচনার গভীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত মণি-মুক্তা কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে ধন্য হতে! সত্যি কি আজ সে বসে আছে সেই ইমাম আজমের সামনে, জগতজোড়া যাঁর সুনাম-সুখ্যাতি! ইসলামী শরীয়তের যিনি শ্রেষ্ঠ মুহাফিজ! ফিকাহ শাস্ত্রের যিনি আলোকিত নক্ষত্র! উসূলে ফিকাহর যিনি গর্বিত জনক! শরীয়তের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ যাঁর আলোকিত চিন্তার সোনালী ফসল! 'আসরারে শরীয়ত'

উদঘাটিত হয়ে চলেছে যাঁর হাতে একের পর এক! ইসলামী আইনশাস্ত্রকে যিনি খুঁজে খুঁজে বের করেছেন, গুছিয়েছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন তারপর যুক্তিগ্রাহ্য করে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন! এই ইমাম আজমের সামনেই আমি এখন বসে আছি?! শোকর তোমার হে আল্লাহ!!

চার.

সেদিন ইমাম আজমের হালকায় চলছিলো আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লার একটু আগের রায় নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক। বিস্ময়কর শান্তভাবে ইমাম আজম শুনে যাচ্ছিলেন প্রাণবন্ত যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি। পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের যুক্তিই শুনছিলেন তিনি হাসিমুখে সমান গুরুত্ব দিয়ে। সবার কথা ও যুক্তি শেষ হলে এবার তিনি প্রস্তুত হলেন নিজের মত পেশ করতে। তিনি বললেন– 'ইবনে আবি লায়লার এই রায়ে ছয়টি ভুল হয়েছে।

১. তিনি মসজিদে শাস্তি দিয়েছেন। অথচ মসজিদ শাস্তির জায়গা নয়।

২. তিনি দাঁড় করিয়ে বেত্রাঘাত করেছেন। অথচ মহিলাদেরকে বসিয়ে শাস্তি দিতে হয়।

৩. দু'বার তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বাবার পক্ষ থেকে একবার, মা'র পক্ষ থেকে একবার। অথচ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জামাতের বিরুদ্ধেও অপবাদ আরোপ করে, তবুও শাস্তি একটিই হয়।

৪. তিনি দুই 'হদ'কে একসাথে জমা করেছেন। অথচ শাস্তি যাতে লঘু হয় এই জন্যে দুই 'হদ'কে একসাথে জমা করতে নেই।

৫. এক উন্মাদিনীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অথচ পাগলদের উপর কোনো শাস্তি প্রযোজ্য নয়।

৬. অনুপস্থিত পিতা-মাতার পক্ষে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অথচ অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে শাস্তি দাবি না করলে শাস্তি দেওয়া যায় না।

শেষ করলেন ইমাম আজম তাঁর ঐতিহাসিক মত ও রায়। শেষ করলেন তাঁর অমর ফিকহী দৃষ্টিভংগী ও অবিনাশী সিদ্ধান্ত। উপস্থিত ছাত্ররা বিস্ময়-বিমুগ্ধতার কালি দিয়ে প্রথমে লিখলো তা নিজেদের হৃদয়-ক্যানভাসে। কিন্তু

যদি মুছে যায় হৃদয়-ক্যানভাসের কোনো বর্ণ? কোনো শব্দ? কোনো বাক্য? তাহলে ইসলামী আইনের এই চিরন্তন ব্যাখ্যা থেকে তারা যে বঞ্চিত হবে! তাই সাথে সাথেই লিখে ফেললো তারা কাগজেও।

মিশরী আগন্তুক উৎকর্ণ হয়ে এতোক্ষণ শুনছিলো ইমাম আজমের কথা। এবার মজলিস যখন শেষ হয় হয় অবস্থা, তখন সে এগিয়ে গেলো ইমাম আজমের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, ভক্তির ঝাঁপি মাথায় নিয়ে। মুসাফা করলো শ্রদ্ধার সুরভি ছড়িয়ে। ইমাম আজমের নূরানী চেহারার ঝলকে ঝলকে, তাঁর প্রতিটি কথা ও আচরণ থেকে বেয়ে পড়া আল্লাহভীতির দীপ্তিতে দীপ্তিতে ভরে গেলো তার হৃদয়-মন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ইমাম আজম তাঁর কয়েকজন অনুপস্থিত ছাত্রের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যারা অসুস্থ, তাদের সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিলেন। যাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের দেখে আসতে পারেন।

গৃহে যাবার সময় তিনি মিশরী আগন্তুককে সাথে নিতে ভুললেন না। ইমাম আজম তাকে বললেন– 'যতোদিন তুমি কুফায় থাকবে আমার মেহমান হয়েই থাকবে।'

পাঁচ.

ইমাম আজমের বাড়িও ছিলো আরেক মাদরাসা। এখানেও রয়েছে তাঁর ছাত্ররা। বিশেষত তারা, যাদের নেই কোনো আর্থিক সঙ্গতি। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। বর্তমান তাদের এমন দারিদ্র-পীড়িত হলেও প্রত্যেকের জন্যেই ইমাম আজমের সুসান্নিধ্যে জন্ম নিচ্ছিলো আলোকিত ভবিষ্যত। ইলম ও আমলের ময়দানে সৌরভ ছড়ানো ভবিষ্যত। রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা ও জ্ঞানী-গুণীদের কাছেও যা ঈর্ষণীয়। তা ছাড়া অভাবী মানুষ বসেছিলো সাহায্যের আশায় ইমাম আজমের আগমনের অপেক্ষায়। ইমাম আজম যেমন ছিলেন জ্ঞানবীর, তেমনি ছিলেন দানবীর। জ্ঞান পিপাসুরা ফিরে যেতো জ্ঞান নিয়ে আর অভাবীরা ফিরে যেতো প্রয়োজন পুরা করে।

ইমাম আজম যেখানেই যেতেন আগন্তুককে সাথে করে নিয়ে যেতেন। ইমাম আজমের বিস্তৃত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আগন্তুক দেখলো আরেক ইমাম আজমকে, ব্যবসায়িক সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় তাঁর অবস্থান। যখনই আসছে ক্রেতা, ইমাম আজমের মধুর ব্যবহারে এবং তাঁর পণ্যের শ্রেষ্ঠত্বে, সে ফিরে যেতো বিমুগ্ধ হয়ে। আবার এখানে ফিরে আসার পণ নিয়ে। এমন যাঁর ব্যবহার, এমন যাঁর পণ্য, এমন যাঁর আমানতদারী, এমন যাঁর সুখ্যাতি তাঁর কাছে মানুষ ছুটে না এসে পারে কি? তিনি মানুষের মনের কথা বুঝতেন। তিনি মানুষের আবেগের ভাষা বুঝতেন। তিনি মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দিতেও জানতেন।

তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই আলো ছড়াতেন। জ্ঞানের আলো, সততার আলো, পবিত্রতার আলো, অভিভাবকত্বের আলো। তিনি কাজের জন্যে সময় ভাগ করে নিয়েছিলেন। যেখানে যতোটুকু সময় দেওয়ার সেখানে ততোটুকু সময়ই দিতেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় দিতেন ইলমের খিদমতের জন্যে, ইবাদত-বন্দেগীর জন্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে। এভাবেই তিনি দুনিয়া আর দ্বীনের মাঝে সমন্বয় করেছিলেন। দুনিয়াকে দ্বীনের আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন।

ছয়.

একদিন ছেলে হাম্মাদ দোকানে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। তাকে বড়ো উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলো। তা ইমাম আজমের দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু নিজে তিনি মোটেও উদ্বিগ্ন হলেন না। উদ্বেগভরা কণ্ঠে ছেলেকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। স্থির শান্ত হয়ে বসে রইলেন। সব সময়ের অভ্যাস অনুযায়ী। বিপদ যদি এসেই থাকে তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে! এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কী আছে? ভড়কে যাওয়ার কী আছে? কিন্তু হাম্মাদ বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারলেন না। বলেই ফেললেন–

'আব্বাজান! মাফ করবেন। আমীর আপনার ফতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।'

ইমাম আজমের চেহারায় দুঃখ ও বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। কিন্তু তা

ক্ষণিকের জন্যে। একটু পরই তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ফিরে এলেন এবং ছেলে হাম্মাদকে ছড়ানো ছিটানো কিছু কাপড় ভাঁজ করে তাকে উঠিয়ে রাখতে বললেন। হাম্মাদ কাপড়গুলো গুছাতে গুছাতে বললেন–

'কারণটা জানতে চাইলেন না যে আব্বাজান?!'

'বলো কী কারণ!'

'বিস্তারিত পরে জানাবো। তবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে উম্মে ইমরানের ব্যাপারে ফতওয়া দিয়ে ইবনে আবি লায়লা বেশ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যেই পড়ে গেছেন। তার ফতওয়ার বিরুদ্ধে আপনার ফতওয়া প্রদানের পর। তাই মনে হয় তিনি আমীরের কানে ব্যাপারটা বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলেছেন। ফলে আমীর এই ফরমান জারি করেছেন যে কেউ যেনো তার দেওয়া ফতওয়ার সমালোচনা না করে এবং ভুল-ক্রটি না ধরে। যাতে আদালতের গুরুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে এবং তার ধারণা অনুযায়ী মানুষের চোখে ফতওয়ার মর্যাদা কমে না যায়। আর তা ছাড়া আগে থেকেই আমীর আপনার ব্যাপারে প্রসন্ন ছিলেন না। কেননা আপনি আমীরের কোনো কোনো কাজ ও সিদ্ধান্তের খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন।'

ইমাম আজম মৃদু হাসলেন। দোকান থেকে বেরুতে বেরুতে অত্যন্ত আস্থার সাথে বললেন–

'সত্য প্রকাশে আল্লাহ্ লজ্জা করেন না।'

এরপর ইমাম আজম গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। আর অনুচ্চ কণ্ঠে আওড়ালেন– 'ঠিক আছে হে আমীর! আপনি 'না' করলে আমি আর ফতওয়া দেবো না!'

ইমাম আজম ধৈর্য ধরলেন। নীরব রইলেন। এদিকে উম্মে ইমরানের ব্যাপারে ইবনে আবি লায়লার ফতওয়ার কথা কুফার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি বসরা, মক্কা-মদীনাতেও তা জানাজানি হয়ে গেলো। পাশাপাশি ইমাম আজমের উপর ফতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞার কথাও সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। মানুষের মুখে মুখে এই আলোচনাই চলতে লাগলো। সবার কাছেই ইমাম আজমের মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব আরো বেশি করে ফুটে উঠলো। সবার মনে তিনি একান্তে জায়গা করে নিলেন।

সাত.

একদিন বিষণ্ন চেহারা নিয়ে মিশরী আগন্তুক ইমাম আজমের খিদমতে হাজির হয়ে মিশর ফিরে যাওয়ার ইরাদার কথা জানালো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে বললো–

'হে মহান ইমাম! আপনার কাছে যতোদিন ছিলাম বড়ো ভালো ছিলাম। আপনার কথা ও কাজে কী সুন্দর মিল! এখন আমি এক নতুন জীবন নিয়ে মিশরে ফিরে যাচ্ছি!'

'ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।'

'কিন্তু যে জিনিসটি হাজারো আনন্দের মাঝে আমাকে ব্যথিত করছে তা হলো আপনার বিরুদ্ধে আমীরের নিষেধাজ্ঞা এবং ফতওয়া প্রদান থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বাধ্য করা। আপনি তো অন্যায় কিছু বলেন নি! সঠিক এবং স্বাধীন রায়ই তো প্রকাশ করেছেন! কেনো আরোপিত হবে আপনার উপর এই নিষেধাজ্ঞা! এই ব্যথা বুকে নিয়েই আজ মিশরের পথে বের হচ্ছি!'

মিশরী বন্ধু আসলে সবার মনের কথাই বলেছেন। কুফা, বসরা, ও মক্কা-মদীনা– কোথায় না আজ মানুষ ব্যথিত?! ইমাম আজম এখন আর ফতওয়া দিতে পারবেন না– এ কথা কেউ মেনে নিতে পারছে না।

ইমাম আজমের হাতে মানুষ তৈরী হয়!

প্রজন্ম আলোকিত হয়! উম্মত দিশা পায়!

সেই ইমাম আজমকে আজ মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হবে?

সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারবেন না তিনি?!

এ মেনে নেওয়া যে বড়ো কঠিন!!

ইমাম আজম মিশরী বন্ধুর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। গভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন। ইলমের ফজিলত, আলেমের দায়িত্ব, আলেমের সম্মান, আরো কতো কী বললেন! এক পর্যায়ে মহান ইমাম বললেন–

'ভাই! সবচে' উত্তম কথা হলো সে কথা, যা বলা হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে। যে দুনিয়ার জন্যে ইলম হাসিল করে, সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। ইলম তার হৃদয়ে দৃঢ় হয় না। আর যে দ্বীনের জন্যে ইলম হাসিল করে, তার ইলমের মধ্যে আল্লাহ সীমাহীন বরকত দান করেন। তার হৃদয়ে ইলম

দৃঢ়তা লাভ করে। মানুষও তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়।'
মিশরী বন্ধুটি তখন বেশ ক্ষোভের সাথে বললো–
'কিন্তু আলেমদের সাথে এবং দ্বীনের মুহাফিজদের সাথে কি এমন আচরণই করা হয় যা আপনার সাথে করা হয়েছে?!'
'রাগ করো না ভাই! ধৈর্য ধরো। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।'

আট.
হঠাৎ হাম্মাদ দৌড়াতে দৌড়াতে এসে প্রবেশ করলেন এবং বললেন–
'আব্বাজান! আমীরের বিশেষ দূত এসেছে! গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনার সাক্ষাত প্রার্থী!'
ইমাম আজম তাকে বললেন–
'স্বাগতম! কিন্তু আমার মনে হয় হাম্মাদ! তোমার এতোটা প্রভাবিত হওয়া উচিত না! তাকে তাশরিফ আনতে বলো।'
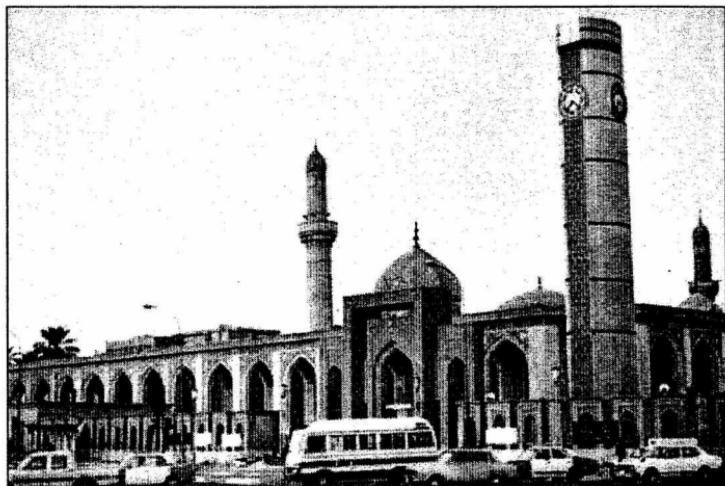
ঐতিহাসিক কুফা নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত ইমাম আজম মসজিদ,
পাশেই শুয়ে আছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহ.

ইমাম আজম তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী হাসিমুখে আমীরের দূতকেও সাদরে সম্ভাষণ জানালেন। সবাইকে তিনি এভাবেই স্বাগত জানান। কোনো তারতম্য

করেন না। আমীরের দূত এবং ইমাম আজমের মাঝে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো। শেষে ইমাম আজম বললেন–

'কিন্তু আমি তো নিষিদ্ধ! আমি কী করে ফতওয়া দেবো?!'

'ঠিক আছে হুজুর! তাহলে আমীরকে আমি তা-ই গিয়ে জানাবো!'

দূত বেরিয়ে যাওয়ার পর মিশরী বন্ধু ইমাম আজমের খিদমতে আরজ করলেন–

'আপনি আমাকে তৃতীয় পক্ষ না ভাবলে বলবেন কি ঐ লোকটি কী বলতে এসেছিলো?!'

ইমাম আজম মুখে মৃদু হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বললেন–

'দূত এসেছিলো আমীরের পক্ষ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে!'

'কী মাসয়ালা?'

'জানি না! আমি তো ফতওয়া দিতেই অস্বীকার করেছি!'

'কিন্তু কেউ মাসয়ালা জানতে এলে আপনি কি তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে পারেন?!'

ইমাম আজম আবার মৃদু হাসলেন! বললেন–

'আমার কী দোষ! আমি তো ফতওয়া প্রদানের অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিলাম!'

কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতেই ইমাম আজমের কাছে আমীরের পক্ষ থেকে পৌঁছলো এই মর্মে এক চিঠি–

'পেছনের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত! আপনার ফতওয়া প্রদানে কোনো বাধা নেই!'

ইমাম আজম এরপর বড় আবেগ-মথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন–

'হে রব আমার! কিয়ামতের কঠিন দিনে আমার প্রতি রহম করো! তোমার আজাব থেকে বাঁচাও! মাফ করে দাও আমার সকল অপরাধ! না হলে হিসাব দিবসের কঠিন দিনে কী অবস্থা হবে আমার?'

লেখক- নজীব কিলানী

মিশর

প্রবেশদ্বারের সামনে

এক.

আল-আমুদ প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রতিদিন মাথা উঁচিয়ে আসা-যাওয়া করতো ও। এই দশাসই আকৃতির সুদর্শন যুবকটি এ পথে বেরুলেই একঝাঁক মুগ্ধ দৃষ্টি ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকতো। যুবকও পথিকদের নিবদ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ ফেরাতো। তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেনো খুঁজতো। গভীর করে লক্ষ্য করলে মনে হতো– ওর সন্ধানী দৃষ্টিতে ছলছল করছে 'স্বজন-খোঁজা, 'প্রিয়-খোঁজা' একটা মায়াবি কাতরতা। কতো স্বজনই তো ওর জীবন থেকে একে একে হারিয়ে গেছে! সেই প্রিয় মুখগুলো এখন শুধুই স্মৃতি। বেদনাঘেরা স্মৃতি। ওর শোক-মথিত হৃদয়ে এসে ঢেউ তোলে।

আল-আমুদ প্রবেশদ্বার (অনেকে যাকে 'দামেস্ক প্রবেশদ্বার'ও বলে থাকে) জেরুজালেম নগরীর সবচে' প্রাচীন ও প্রধান প্রবেশদ্বার। এ প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রতিদিন জেরুজালেমের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ আসা-যাওয়া করে। দল বেঁধে শিক্ষার্থীরা পাঠশালায় যায়। শ্রমিকরা কাজে যায়। আরো নানা মানুষ যায় নানা গন্তব্যে। এ সুবাদেই আল-আমুদ হয়ে উঠেছিলো সবার নিত্য চলার পথ।

আল-আমুদ প্রবেশদ্বার হয়ে একটা সরু গলি চলে গেছে ২০০ মিটার ভিতরে 'বাবু খানিয যাইত' মহল্লা'র দিকে। এ মহল্লাতেই থাকে যুবক। নাম মাহমুদ আল-কুরদ। মাহমুদকে নিয়ে যখন আমি লিখতে বসেছি তখন ও আর নেই! 'মাহমুদ-শূন্যতায়' বুকটা আমার খা খা করছে। মাহমুদকে আমরা হারিয়েছি আজ কতোদিন, তবু ওর স্মৃতিটা সব সময় মনে জ্বলজ্বল করে। ও চলে গেছে

চিরতরে সবাইকে একটা বার্তা পৌঁছে দিয়ে। ওর এ বার্তাটা ভেসে বেড়াচ্ছে ফিলিস্তিনের আকাশে-বাতাসে। কান পাতলেই শোনা যায় সেই বার্তা!
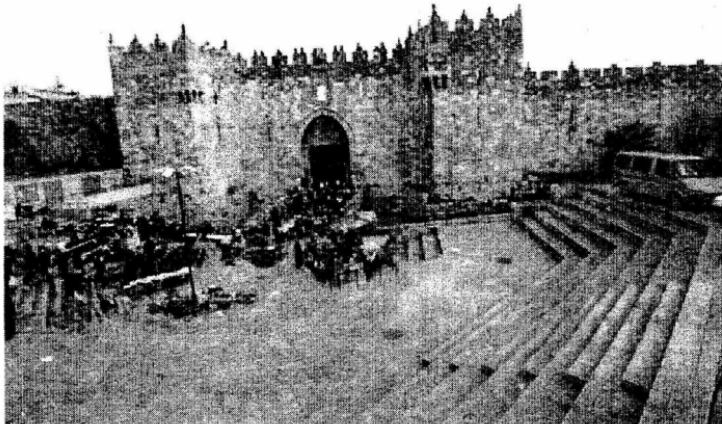
ঐতিহাসিক আল আমুদ প্রবেশদ্বার

কান্নাময় কিছু শব্দ! বেদনাঘেরা কিছু বর্ণমালা! 'ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কোনো জায়গা নেই। এখানকার ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি আমাদের কাছে আমানত। ফিলিস্তিনী মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রুও আমাদের কাছে গচ্ছিত আমানত। দখলদার ইহুদীদের নাপাক দলন-মথন ও বেশরম হামলা থেকে ফিলিস্তিনকে বাঁচাতে না পারলে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই!'

ফিলিস্তিনের জাগ্রত কবি সামিহ্ আল কাসিমের কবিতার কয়েকটি পংক্তি পড়তে যেয়ে আজ মাহমুদকে আমি বড়ো অনুভব করছি। কবি যেনো মাহমুদকেই চিত্রিত করেছেন এখানে–

'আমি হাঁটি 'উন্নত শির' হয়ে,
আকাশ-ছোঁয়া দৃষ্টি নিয়ে!
আমার হাতে যয়তুন বৃক্ষের লম্বা ডাল,
কাঁধে আমি বয়ে নিয়ে চলেছি কফিন!
আমি হাঁটি, এভাবেই হাঁটি!'

দুই.

মহল্লা'র কিশোরী-তরুণীদের চোখে মাহমুদ ছিলো 'স্বপ্নের যুবরাজ'। মাহমুদের হাসি ওদের হৃদয়-মনে 'ব্যাকুলতা' ছড়িয়ে দিতো। ওকে নিয়ে ওরা নিজেদের ভিতরে চোখের ভাষায় কথা বলতো। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নীরবে যেনো বলতো– 'সখি! হয়তো তোর কপালেই আছে মাহমুদের 'রাজটিকা'টা!'

মাহমুদ পূর্ণ যুবক। এখনো অবিবাহিত। কিশোরী-তরুণীরা তাই তাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনে। মাহমুদ দূর থেকে সবই অনুভব করে। ব্যাকুল অস্থিরতায় নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে– 'কারো সাথে কি আমার ঘর বাঁধা হবে? ঘর সাজাবার সুযোগ কি আসবে? তার আগেই যদি গর্জে উঠে কোনো ইসরাইলী ঘাতক বুলেট!'

তিন.

মাহমুদ ভালো 'ফুটবল' খেলোয়াড় ছিলো। ১৯৭৪ সালে 'পশ্চিম তীর কাপ' জিতেছিলো ওর দল। সে থেকে সবাই এক বাক্যে মাহমুদকে জানতো। জেরুজালেমে এবং জেরুজালেমের বাইরে।

যে বলে– 'পুরুষ কাঁদে না', সে ভুল বলে। সে সম্ভবত জানেই না– প্রকৃত পুরুষের কান্নার প্রকৃত অর্থ। অথবা সে এই প্রবাদে প্রভাবিত– 'ইন্নাল বুকাআ লিন্‌নিসাঈ ওয়াল আতফাল'– কান্না! সে তো নারী আর শিশুর কাজ!' শিশুদের অভিমানি কিংবা গাল- ফোলানো কান্না বন্ধ করতে সম্ভবত তাই বলা হয়– 'ছি! অমন করে কাঁদতে নেই! তুমি না বড় হয়ে গেছো!' আমার মতে কান্না (নীরব অশ্রু বিসর্জন) হলো ওয়াফাদার ও বিবেকবান মানুষের জন্যে একটা 'টেক্স' যা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়দের স্মরণে নিবেদন করে তারা মনকে হালকা ও নির্ভার করেন। সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। প্রিয় মানুষকে স্মরণ করে ক'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন– সে তো মুক্তোমূল্যকেও ছাড়িয়ে যায়! তাহলে তা শুধু নারী আর শিশুর একার 'সম্পদ' হবে কেনো?

চার.

'বাবু খানিয যাইত'-এর পাশ দিয়ে গেলেই মাহমুদের স্মৃতি আমাকে কাতর করে তোলে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। অমন দরদি বন্ধুকে ভুলে থাকা যায় না। 'বাবু খানিয যাইত'-এর কিনারেই ছিলো ওদের বাসা। ও ছিলো মহল্লার সবার ভালো বন্ধু। সমবয়সী ও সহপাঠিদের আসরের মধ্যমণি। ওদের সাথে প্রায়ই আমার বসা হতো 'আন্দালুস লাইব্রেরি'র সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। এখানে বসলে আসর খুব জমে উঠতো। এই 'আড্ডা'য় ওর সবচে' ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলো আহমদ ওয়াইস। দু'জন এক সঙ্গে শরীর চর্চা করতো জামিল নূরির কাছে– 'খৃষ্টান যুব এসোসিয়েশন'-এর কাছে। মুনযির বরকত এবং আমি (লেখক)ও ওদের সঙ্গি ছিলাম। আমি ভারোত্তোলন করতাম।

'বাবু খানিয যাইত' মাহমুদের শৈশবের স্মৃতি জড়ানো ছোট্ট একটা মহল্লাই শুধু ছিলো না বরং তা ছিলো ওর কাছে ছোটো-খাটো একটা 'দেশ'। এখানেই ওর জন্ম। এখানেই কেটেছে ওর শৈশবের সোনাঝরা দিনগুলো। এখানেই উত্তাপ ছড়িয়েছে ওর যৌবনের রৌদ্র-প্রখর দিনগুলো। এখানে বসেই ও ফিলিস্তিনের স্বাধিনতার স্বপ্ন দেখেছে। এখানে বসেই ও দখলদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার সংকল্পে বারবার জ্বলে উঠেছে। অবশেষে এই এখানেই .. 'বাবু খানিয যাইত'-এর এই আঙ্গিনাতেই ও লুটিয়ে পড়েছিলো শাহাদতের লাল বিছানায়! সে ছবি আজো আমার চোখের সামনে জীবন্ত! আমি এখন কাঁদতে চাই। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে চাই। মাহমুদের স্মরণে কাঁদলে আমার মনটা হালকা হবে। আমার দায়বদ্ধতা কিছুটা হলেও কমবে। আমার শোক-স্মৃতির জ্বলজ্বলে উত্তাপে এখন অশ্রুর ফোঁটাই শুধু পারে শীতল প্রবাহ বইয়ে দিতে। না, অন্য কিছু নয়। প্রিয় হারানোর শোক– শুধু অশ্রু চায়! নীরবে গড়িয়ে পড়া তপ্তাশ্রু!!

পাঁচ.

মাহমুদের বীর মন মুহূর্তের জন্যেও ফিলিস্তিনের বুকে দখলদার ইহুদীদেরকে

সহ্য করতে পারতো না। ওদের বিতাড়নই ছিলো ওর একমাত্র চাওয়া। ওদের অভিশপ্ত পদচারণায় ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটির সাথে সাথে ওর হৃদয়ের মাটিও 'রি রি' করে উঠতো। রাশি রাশি ঘৃণা আর স্তূপ স্তূপ অবজ্ঞা জমে আছে ওদের বিরুদ্ধে মাহমুদের হৃদয়ে। ছোট্ট বেলায় মাদ্‌রাসায় আসা-যাওয়ার পথে কোনো 'গোপন' লিফলেট কিংবা ফিলিস্তিনী পতাকার খোঁজে যখন দখলদার বাহিনী তল্লাশি চালাতো তখন ওদের নাকে-মুখে খসে কয়েকটা কিল-ঘুষি লাগিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করতো মাহমুদের। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনায় ফুঁসে উঠে যখন ফিলিস্তিনের দামাল ছেলেরা ঝাঁঝালো মিছিল বের করতো তখন মাহমুদ থাকতো সবার আগে আগে। ও ছিলো আমাদের চোখে এক 'বীরপুরুষ'। জেরুজালেমের বীরপুরুষ! ওর অবয়বে আমরা বীর সালাহুদ্দীনের ছায়া দেখেছিলাম!

ছয়.

একবার আমরা একটা মিছিল নিয়ে রাস্তা প্রদক্ষিন করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এক দখলদার ইহুদী সৈন্য অস্ত্র উঁচিয়ে 'বাবু খানিয যাইত'-এর দিকে এগিয়ে আসছে। একাকী। সম্ভবত মিছিলটা লক্ষ্য করেই। মিছিলটা থেমে গেলো। অনেকেই ভয়ে জড়োসরো হয়ে কিছুটা দূরে সরে পড়লো। কখন না আবার ইহুদীটা গুলি ছোঁড়া শুরু করে। কাপুরুষ ইহুদীদের এটাই অভ্যাস। ওদের বাপ-দাদারা আগে নির্ভর করতো সুরক্ষিত দুর্গের উপর আর এরা নির্ভর করে এ সব অস্ত্রের উপর। সম্মুখ-সমরে এরা সব সময় ভীতু, কাপুরুষ। একটা ইহুদী সৈন্যের জন্যে এভাবে মিছিলটা থামিয়ে দেয়া মাহমুদের ভালো লাগে নি। একটা ইহুদীর বাচ্চাকে এতো ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয়? মাহমুদ মিছিল থেকে বেরিয়ে নির্ভীক ভঙ্গিতে, দৃঢ়পদে 'শয়তান'টার দিকে এগিয়ে গেলো। একেবারে সামনে গিয়ে মাহমুদ থামলো। মাহমুদ জানে; ইহুদীটা অস্ত্র-সজ্জিত আর সে নিরস্ত্র। তবু মাহমুদ ওর চোখে চোখ রেখে গর্জে উঠলো–

'এখানে কী চাও? কেনো এসেছো?'

ইহুদীটা মাহমুদের দৃঢ় কণ্ঠে কিছুটা ভড়কে গেলো। কী জবাব দেবে– খুঁজে পেলো না। কিন্তু খানিকটা 'হামবড়া' ভাব নিয়ে মাহমুদের দিকে তাকালো। যেনো বলতে চাইছে– 'গুলি মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবো! সাহস কতো! আমাকে ধমক দেয়!' কিন্তু অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিছিলের নীরব জটলাটা ইহুদীটার মনে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে। সে কিছুটা পিছিয়ে এলো এবং মান বাঁচানোর জন্যে কৃত্রিম ধমকের সুরে বললো–

'সাবধান! সামনে বাড়বে না, গুলি করবো!'

মাহমুদ ভয় পেলো না। কেননা মুখে যাই বলুক, ওর চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। মাহমুদ আরো কাছে গেলো। আরো কাছে। তারপর .. তারপর বীর সিংহ যেভাবে শিকারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবেই ইহুদীটার উপর ও ঝাঁপিয়ে পড়লো– শূন্য হাতেই! বয়ে যেতে লাগলো কিল-ঘুষি-লাথি'র একটা ঝড়ো তাণ্ডব! ফিলিস্তিনের আকাশ-বাতাস এবং মাটি ও মানুষ এমন 'সুখ-দৃশ্য' ক'বার দেখবার সুযোগ পেয়েছে? কী মজা! একটা অস্ত্রধারী ইহুদী এক নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী দামালের কিল-ঘুষি আর লাথির সামনে পলায়নের রাস্তা খুঁজছে!!

❂ ❂ ❂

মাহমুদ পরে এসে আমাদেরকে জানিয়েছিলো– 'ইহুদীর বাচ্চাটাকে যখন আমি লাথি মারছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিলো সারা দখলদারগোষ্ঠির মুখে আমি লাথি মারছি! এ ছিলো দখলদারদের কাছে আমার একটা বার্তা। আমার নয়; সকল ফিলিস্তিনীর বার্তা। ঐ সৈনিকবেশী শয়তানটাকে যখন আমি পেটাচ্ছিলাম তখন আমার মনে কোনো ভয় ছিলো না। যে কোনো মহূর্তে ও আমার দিকে গুলি ছুঁড়তে পারে– এ ভয়ও আমাকে তাড়িত করে নি। বিশ্বাস করো; আমি ইচ্ছে করলে ওকে মেরেই ফেলতে পারতাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি। ও ফিরে যাক। ওর মা'কে গিয়ে বলুক– 'এক ফিলিস্তিনী যুবক আমার জীবন 'রক্ষা' করেছে! নাগালে পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিয়েছে!'

এ দিকে ছাড়া পেয়ে ক্ষত-বিক্ষত ইহুদীটা পড়ি-মরি করে কী করে যে পালিয়েছিলো, তা ছিলো দেখার মতো! ফিলিস্তিন তার রক্তলাল ইতিহাসে এ রকম কিছু 'বিজয়-দৃশ্য'- এর জন্যে গর্ব করতেই পারে!

সাত.

এর কয়েক মাস পরের ঘটনা। প্রিয় 'বাবু খানিয যাইত'-এর প্রিয় জায়গাটা অর্থাৎ 'আন্দালুস লাইব্রেরী'র সামনে মাহমুদ দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ একটা ক্ষীণ আর্তচীৎকার তার কানে ভেসে এলো। উৎসটা খুঁজে বের করতে হলো না। দিনের আলোয় পরিস্কার দেখা গেলো ইসরাইলী পদাতিক বাহিনীর একটা টহল দল এক কিশোরী ছাত্রীকে বন্দুকের বাট দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে নিয়ে যাচ্ছিলো। মাহমুদের কপাল কুঞ্চিত হলো। মাহমুদ এ দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলো না। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে .. ফুঁসতে ফুঁসতে ও ছুটে গেলো। গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে ঐ জালিমদের মুখোমুখি। মেয়েটার চেহারায় আঘাত লেগেছে। টপটপ রক্ত পড়ছে। রক্তে ওর শুভ্র 'স্কুল-ড্রেস' লালে লাল। 'বাবু খানিয যাইত'-এর পথিকদের পথচলা থেমে গেলো। মুখের ভাষায় না হলেও চোখের ভাষায় তারা মাহমুদের এগিয়ে যাওয়াকে 'স্বাগত' জানালো। নিজেরা নিজ নিজ জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় এবং ভয়াবহতায় প্রতিবাদের স্বাভাবিক ভাষাটাও তারা বুঝি হারিয়ে ফেলেছে!

কিন্তু মাহমুদ তাদের দলের না।

মাথাটা উঁচিয়ে ..

বুকটা টান করে বীরত্বের সুবাস ছড়িয়ে ..

দখলদারদের বন্দুক-মেশিনগানকে উপেক্ষা করে ..

মনটায় প্রতিবাদ-প্রতিশোধের দাউদাউ আগুন জ্বেলে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো!! একদিকে পাঁচ সদস্যের সশস্ত্র টহল দল। আরেক দিকে নিরস্ত্র মাহমুদ একা! সাথে আছেন শুধু আল্লাহ!! তাই ওর একক কণ্ঠের হুঙ্কারটাও আকাশে বাতাসে ঝড় তুললো–

'এই পাষণ্ডের দল! কোন্ অধিকারে এবং কী অপরাধে এক কিশোরীকে রক্তাক্ত করছো? হারাম! হারাম!! এই মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দাও!'

'তুই আবার কোত্থেকে নাযিল হলি বেটা! সরে যা! জলদি সরে যা!' মাহমুদের বুকের দিকে বন্দুক তাক করে বললো একটা সৈন্য। কিন্তু জুলুমের রক্তে প্লাবিত ১৩/১৪ বছরের এক কিশোরীকে একদল হায়েনার হাতে ছেড়ে দিয়ে

মাহমুদ চলে যাবে,
জেরুজালেমের বীর চলে যাবে,
আগামী দিনের সালাহুদ্দীন চলে যাবে,
'বাবু খানিয যাইত'-এর সিংহ চলে যাবে,
কিশোরী-তরুণীদের 'হৃদয়-রাজা' চলে যাবে—
এমনটি কি ভাবা যায়?! অকল্পনীয়! অসম্ভব!!
কিশোরীর আর্তচীৎকার বিদীর্ণ করতে লাগলো মাহমুদের হৃদয়কে, দংশন করতে লাগলো ওর বিবেককে!
'ভাইয়া! আমাকে বাঁচান! আমাকে এদের হাতে ছেড়ে চলে যাবেন না! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! আপনি যাবেন না! যাবেন না .....!!'

রুদ্ধ হয়ে এলো কিশোরীর কণ্ঠ। ও জানে না, ওর আর্তচীৎকার মাহমুদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে কি না। কিন্তু মাহমুদের জ্বলে জ্বলে ওঠা চোখে একবার ওর দৃষ্টি পড়েছিলো। সেখানে দেখেছে ও একটা মায়াবী রেখা! ঐ রেখাটা ওকে আশ্বস্ত করছে! তাই অশ্রু ও রক্তের ভিতরেও হায়েনাদের কবল থেকে মুক্তি লাভের একটা আলো ওর চোখে-মুখে আভা ছড়াতে লাগলো। ফুটে উঠলো একটা প্রত্যয়। তাই মাহমুদকে ও কাঁদতে কাঁদতে আবার বললো—
'ভাইয়া! ওরা আমার 'স্কুল-ব্যাগ'-এ একটা ফিলিস্তিনী পতাকা পেয়েছে। তাই আমাকে অমন করে মারছে! আপনি কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না!!'

মাহমুদ জ্বলছিলো! মাহমুদ ফুঁসছিলো। আহ! এখন যদি 'সুপারম্যান'-এর শক্তি তার গায়ে এসে ভর করতো, সবাইকে যদি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়া যেতো! ধুত্! কী সব ভাবছে! হাবিজাবি ও মিথ্যা এই 'সুপারম্যান'-এর আবার কী দরকার? সবচে' বড় শক্তি আল্লাহ-ই তো আছেন ওর সাথে!

মাহমুদ সৈনিকটির হুঁশিয়ারী উপেক্ষা করে আরো সামনে বাড়লো। আরো কাছে এসে দাঁড়ালো। ভাবতে লাগলো— কী করে কিশোরীর মুক্তি-অভিযানটা শুরু করা যায়। মাহমুদ দ্বিতীয়বার গর্জে উঠলো—

'এই কুত্তার বাচ্চারা! ওকে জলদি ছাড়!!'

মাহমুদের আকাশ-কাঁপানো হুঙ্কারে .. সাহসিকতায় কিশোরীর কান্না থেমে গেলো। বড় বড় চোখে ও তাকিয়ে রইলো ওর 'উদ্ধারকারী'র দিকে! ফিলিস্তিনী মায়ের এক গর্বিত বীরের দিকে! ফিলিস্তিনী মা'দের 'বীর রক্ত' তখন কিশোরীর ভিতরেও জ্বলে উঠলো! মাহমুদের দিকে ও বীরত্বমাখা .. কৃতজ্ঞতা-ধোওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো! ও যেনো মাহমুদের মাঝে খুঁজে পেয়েছে 'নতুন মু'তাসিম'কে! 'এই কুত্তার বাচ্চারা! ওকে জলদি ছাড়!!' – মাহমুদের এই হুঙ্কারটা ওর মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিলো। সজোরে আঘাত করলো। কী হবে এই নরপশুদের সামনে অশ্রু ফেলে! ওদের কাছে কী মূল্য আছে অশ্রুর!

ফিলিস্তিনী 'মু'তাসিম'-এর সামনে দাঁড়িয়ে ও বেশ শক্তি অনুভব করলো। কান্নাকে শক্তিতে পরিণত করলো। তারপর বীর মাহমুদের অনুকরণে বীরত্বময় ব্যঞ্জনায় সে নিজেও চীৎকার করে উঠলো–

'তোমরা কুকুর! তোমরা নেকড়ে! আমাকে ছেড়ে দাও বলছি!'

'বাবু খানিয যাইত'-এর স্তব্ধ জনতা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। আজ কিছু একটা ঘটবেই! এমন সাহসী প্রতিরোধচিত্র তারা খুব কমই দেখেছে। মাহমুদ অনমনীয়, দুর্দমনীয়। একদল জলজ্যান্ত জল্লাদ ওর দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। অস্ত্রবলে, শক্তিবলে কোনো বলেই ওদের সাথে মাহমুদের পেরে ওঠার কথা নয়। তবু মাহমুদ অপ্রতিরোধ্য। ইহুদী সৈনিকরা মাহমুদের নির্ভীকচিত্ততা ও বীরত্বে অবাক হলো। রীতিমত ভড়কেও গেলো। মাহমুদ এবং কিশোরী মেয়েটির হুঙ্কারে ওদের অস্ত্রবলে কোনো চিড় না ধরলেও মনোবলে চিড় ধরলো। এই অস্ত্রবলের উপর ভর করেই একটা সৈন্য সহসৈন্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলো–

'বোকাটা দেখি মরতে এসেছে! ও পাগল-টাগল নয় তো?!'

'ও মেয়েটাকে উদ্ধার করতে মরিয়া। যে কোনো মূল্যে মেয়েটাকে ও উদ্ধার করতে চাচ্ছে। কিন্তু কেনো? মেয়েটা তো ওর অচেনা, অজানা!' আরেকজনের বিস্ময়।

'না, এই মেয়েটা ওর কাছে অনেক কিছু। মেয়েটা ওর কাছে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র! চেতনা, বিশ্বাস, আক্বিদা। ওর কাছে এখন মেয়েটার জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া মানে দেশের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া। এ ধরনের মৃত্যু ফিলিস্তিনীদেরকে একদম বিচলিত করে না। বরং এ মৃত্যু ওদের কাম্য। কেননা ওদের ভাষায় এটা শহিদী মৃত্যু।' আরেকজনের বিশ্লেষণ।

আট.

মাহমুদ দেখলো– ওরা স্বাভাবিক পন্থায় মেয়েটাকে ছাড়বে না। ওকে ধরে নিয়ে যেতে চায় নিজেদের আস্তানায়। এ সুযোগটা কোনোভাবেই ওদেরকে দেয়া যায় না। মাহমুদ চূড়ান্ত আক্রমণের মানসিক প্রস্তুতি নিলো। ওদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবলো– খলিফা মু'তাসিম তো রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন– এক নির্যাতিত মহিলার আর্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে। কিন্তু তিনি তো 'খলিফা মু'তাসিম'! আর আমি তো আমি! আমার তো তাঁর মতো সৈন্যবলও নেই, অস্ত্রবলও নেই! তাহলে এই অসহায় কিশোরীকে কী করে আমি উদ্ধার করবো? কিন্তু এভাবে ভাবছি কেনো আমি? নাই বা থাকলো আমার সৈন্যবল কিংবা অস্ত্রবল, ঈমান তো আছে, দেশ তো আছে, আমার জাতি তো আছে! আমার জায়গায় খলিফা মু'তাসিম হলে কী করতেন? এই অবলা নারীকে এভাবে একা ছেড়ে নিজের জানটা নিয়ে চলে যেতে পারতেন কি? অকল্পনীয়, অসম্ভব!

মাহমুদ নিজের ভিতরে খলিফা মু'তাসিমের শক্তি অনুভব করলো। খলিফা মু'তাসিমই এখন ওর 'সুপারম্যান'! মাহমুদ আরো একবার গর্জে উঠলো–

'ওকে ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দাও বলছি! ও কোনো অপরাধ করে নি! অপরাধ সব তোমাদের! তোমরাই আমাদের দেশ দখল করেছো! বাঁচতে চাইলে দ্রুত আমাদের দেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাও!'

'সাবধান! তুমি আর এক কদমও সামনে বাড়বে না! গুলি করবো!!' ইহুদী সৈনিকদের কণ্ঠে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হলো! কিন্তু মাহমুদ কোনো পরোয়া করলো না! হঠাৎ ও ঝাঁপিয়ে পড়লো উদ্ধার অভিযানে! একটা হেঁচকা টানে

ওদের হাত থেকে কিশোরীকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলো! এবার মুক্তির উপত্যকায় পা রাখার পালা! এবার কিশোরীকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার পালা! কিন্তু মাহমুদ আর সামনে বাড়তে পারলো না। এক সঙ্গে গর্জে উঠলো পাঁচটা বন্দুক! ঝাঁঝরা হয়ে গেলো মাহমুদের বুক! লুটিয়ে পড়লো মাহমুদ! অপারেশনটা কি তাহলে অসমাপ্তই থেকে গেলো!!

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরীটা ছুটে এসে আছড়ে পড়লো মাহমুদের নিথর লাশের পাশে!! দু'হাতে নাড়ালো!! ওর স্বপ্নের বীরপুরুষ ওকে মুক্তির তীরে পৌঁছে দিয়ে সত্যিই চলে গেলো?! কিশোরী আবেগে-উত্তেজনায় মাহমুদের কপাল ও চেহারায় হাত বোলাতে লাগলো! পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা দানবগুলোকে ও কোনো পরোয়া করলো না। বরং চীৎকার করে ও বলতে লাগলো–

'তোমরা অমানুষ! তোমরা কুকুর!! তোমরা ওকে মেরে ফেলেছো!!'

সৈন্যরা আশ-পাশের শোক-স্তব্ধ জনতাকে দূরে সরে যেতে বললো। শূন্য আকাশে গুলি ছুঁড়ে ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করলো। কিন্তু না, কেউ ভয় পেলো না। কেউ এক কদমও নড়লো না। বরং সবার চোখ-মুখ কঠিন হতে লাগলো। বর্বর সৈন্যগুলি ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠলো। আর সামনে বাড়ার সাহস পেলো না। আজকের দৃশ্যটা ওদের কাছেও নতুন। যে কোনো মুহূর্তে ওরাও এখন আক্রান্ত হতে পারে– এই আশঙ্কায় স্থান ত্যাগ করে .. পেছনে তাকাতে তাকাতে চলে গেলো! যেনো একদল ধাওয়া-খাওয়া ইঁদুর! আকাশ-বাতাস কি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছিলো– হে ফিলিস্তিনের 'বীররা'! ইহুদীদের অস্ত্রকে এতো ভয় পাও তোমরা? এক কিশোরীকে নাজেহাল করেছে যারা, মাহমুদকে এইমাত্র শহীদ করলো যারা, শুধু অস্ত্রের ভয়ে আর জীবনের মায়ায় ঐ নাপাক সৈন্যদেরকে তোমরা ছেড়ে দিলে? দিতে পারলে?!! কেনো তোমরাও মাহমুদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে না? মনে রেখো; কাপুরুষতার এইসব ছোট-বড় আবরণ না খুললে তোমাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে! আরো নতুন নতুন 'সাবরা শাতিলা' সামনে আসবে!'

নয়.

কিশোরী মেয়েটা তখনো মাহমুদের পাশে বসে চীৎকার করছিলো। কাঁদছিলো। কাঁদুক মেয়েটা। ও তো কাঁদবেই! জান-জীবন বিলিয়ে দিলো যে যুবক ওকে উদ্ধার করতে, তাকে অমন চোখের সামনে লুটিয়ে পড়তে দেখলে কেমন করে ও অশ্রু সামাল দেবে? কী করে সম্ভব হবে শোকের বাঁধভাঙা স্রোতের মুখে বাঁধ দেয়া?!

দশ.

শহীদ মাহমুদের রক্তের দাগ এখনো মুছে নি। 'বাবু খানিয যাইত' থেকে ১০০ মিটার দূরে মাহমুদ শুয়ে আছে! ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আজো অশ্রু ঝরায় শোকাহত ফিলিস্তিনীরা। নিশ্চিত, এই শোকাহত কাফেলার ভিতরে শামিল হয়ে ঐ কিশোরীও মাহমুদের স্মরণে শোক-বিহ্বল হয়ে অশ্রু ঝরায়!

আমি আবার কবি সামিহ আল কাসিমের কবিতাটা আওড়ালাম .....

'আমি হাঁটি 'উন্নত শির' হয়ে,
আকাশ-ছোঁয়া দৃষ্টি নিয়ে!
আমার হাতে যয়তুন বৃক্ষের লম্বা ডাল,
কাঁধে আমি বয়ে নিয়ে চলেছি কফিন!
আমি হাঁটি, এভাবেই হাঁটি!'

লেখক- আদিল সালিম
ফিলিস্তিন

আমাদের প্রকাশিত বই

- শিশু কিশোর সিরিজ
  - গল্পে আঁকা ইতিহাস ১-৭
  - জীবন গড়ার গল্প ১-৩
- কিশোর সংস্করণ
  - রমজান আমার ভালবাসা
  - আবু গারিবের বন্দি

স্বত্ব অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৯

প্রচ্ছদ বশির মেসবাহ

বর্ণসাজ মুহাম্মাদ ইউসুফ ০১৭১০১৭২২০২

মূল্য একশত টাকা মাত্র

ISBN 984-70364-0000-5

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

ISBN
984-70364-00005

ডিজাইন, সালসাবীল- ০১৭১১-২৬৬৮৪৫